সেই প্রেম সেই তৃষ্ণা

সেই প্রেম সেই তৃষ্ণ

সম্বিৎ মিত্র

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

SEI PREM SEI TRISHNA

by

Sambit Mitra

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা:) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা:) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন :
ভূপেন সেন

প্রথম সংস্করণ
ফাল্গুন
১৩৬৮

প্রেয়সী অপর্ণা রায়-কে—

সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

"সেই প্রেম সেই তৃষ্ণা" ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস।

"ঐতিহাসিক উপন্যাস কখন ইতিহাস নয়, ইতিহাসের কঙ্কাল মাত্র"—আমার এ কাহিনীও তেমনি ইতিহাস নয়। মূল কাহিনী ঐতিহাসিক হলেও বেশীর ভাগ চরিত্রই সৃষ্ট। দৃশ্যপট কাল্পনিক।

শ্রীযুক্ত ফকিরনারায়ণ কর্মকার রচিত 'বিষ্ণুপুরের অমরকাহিনী' (দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা-৯) পুস্তকখানির প্রথম অধ্যায়টুকুই (১ থেকে ১০ পৃঃ) আমার এ কাহিনীর মূল উপকরণ।

শ্রীযুক্ত ফকিরনারায়ণ কর্মকার (বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া), ডঃ গোপেন্দু মুখোপাধ্যায় (কামারপুকুর কলেজ, হুগলী), শ্রীযুক্ত গৌরমোহন জানা (সোদপুর, হুগলী) আমাকে নানাভাবে নানা উপদেশ ও সাহায্য দিয়ে এই গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত ক'রেছেন।

রচনাশৈলী ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে পরম শ্রদ্ধেয় অগ্রপ্রতিম কথা-সাহিত্যিক প্রয়াত সুবোধ ঘোষ শ্রদ্ধাস্পদকে পরম শ্রদ্ধাবনত শিরে আমি অনুসরণ করেছি।

আমার সকল কৃত্যই এঁদের কাছে ঋণী, তাই ঋণ স্বীকার ক'রে ছোট করার দায় এড়িয়ে কেবল ভাল-মন্দ, শ্লীল-অশ্লীলের বিচারক যাঁরা, প্রার্থীর মত সেই পাঠক-পাঠিকাদের রায় মাথা পেতে নিতে স্বীকৃত রইলাম।

—লেখক

মল্লরাজ কাহিনী সর্বভারতীয় খ্যাতির সম্মানে ভূষিত বাঙ্গালী-জাতির সাফল্যের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাসের সব চাইতে গৌরবময় অধ্যায়।

শ্রীফকিরনারায়ণ কর্মকার

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ।

বসন্ত সমীরের স্পর্শে চঞ্চলিত ফাল্গুনের বিকেল। ছায়াঘন অরণ্যে সারিবন্দী বিশাল শাল, শাল্মলী যেন এক একটি পান্নার মিনার। সোনালী চিল স্বর্ণালী আলোয় পাখা ঝাপটে চলে যাচ্ছে দিগ্‌বলয়ে। সারা দিনমান ছায়া সরে সরে খেলে বেড়াচ্ছে উঁচু-নীচু গৈরিক প্রান্তরে। গহনতর অরণ্য অতিক্রম ক'রে ধীরে ধীরে লাউ গ্রামের দিকে এগিয়ে এলো এক অশ্বারোহী। পঞ্চানন ঘোষালের বাড়ির সামনে এসে তার গতি রুদ্ধ হ'ল।

—"রঘুনাথকে চাই।"—রাজাদেশ ঘোষণা করে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়াল রাজদূত। প্রস্তুত ছিল না কেউ। কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এলেন রঘুনাথ। কয়েকটি রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত। হৃদস্পন্দন দ্রুত হতে দ্রুততর।—কি বলছেন? রাজা আমাকে তলব করেছেন?

অভিবাদন করে মৃদুকণ্ঠে রাজদূত নিবেদনের ভঙ্গিতে বলেন—হ্যাঁ—রাজা নৃসিংহদেব আপনার জন্য প্রাসাদে অপেক্ষা করছেন। তিনি আপনার দর্শন প্রার্থী।

—আমার দর্শন প্রার্থী! শঙ্কা-শিহরণের চকিত চমক। কি হতে পারে, যার জন্য জরুরী তলব? নিজের কাছেই আশ্চর্য ঠেকে রঘুনাথের। কিন্তু না গিয়ে উপায় নেই। রহস্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন মন নিয়ে রহস্য ভেদের অনুসন্ধিৎসা নিয়েই রাজধানীর দিকে রওনা হন রঘুনাথ। গ্রাম ছেড়ে শান্ত গাঢ় বনানীর মধ্যে মিশে যাচ্ছে দুটি অশ্বারোহী। গাছগুলো হুমড়ি খেয়ে পথের উপর পড়েছে। অরণ্য গহন থেকে গহনতর। প্রান্তর বেয়ে অরণ্য নেমে এসেছে উপত্যকার কোলে একটানা সবুজের স্রোতের মত। যেন কোন মহাজীবনের কাব্য তারা রচনা করে চলেছে। মহাকাল এখানে যেন স্তব্ধ দর্শকের মত অযুত-বৎসর ধরে কাব্য রচনা দেখে চলেছে। এ প্রক্রমের শেষ নেই।

শিমুল, কৃষ্ণচূড়া, বট, অশ্বত্থ, শাল, সেগুন গাছের ঠেলাঠেলি, হুড়োহুড়ি;

তার মধ্য দিয়ে পথ ও প্রহর কাটে অশ্বখুরের তালে তালে। মনে পড়ে রঘুনাথের অনেক দিন আগে সেই অনতিক্রান্ত কৈশোরে একবার পালকপিতা পঞ্চানন ঘোষালের সঙ্গে রাজবাড়িতে এসেছিলেন তিনি। বিশাল রাজপ্রাসাদের রন্ধনশালার চাতালে ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল কোন কল্যাণ কামনায়। আহারের জন্য রঘুনাথকে অঙ্গনের একপাশে পৃথক আসন দেওয়া হয়েছিল। হঠাৎ বৃষ্টি আসায় রাজা নৃসিংহদেব নিজে রঘুনাথের মাথায় ছাতা ধরেছিলেন বলে ব্রাহ্মণকুল চিৎকার করে রাজাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিল, বলেছিল 'রাজছত্র' ধরলে তাকে রাজা হ'তে হয়। রাজা নৃসিংহদেব মৃদুহাস্যে আশীর্বাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন—"এই প্রিয়দর্শী বালক যেন রাজাই হয়।"

পথ ফুরিয়ে আসছে। আবছা অন্ধকার নেমে আসছে ধরিত্রীর বুকে। কৃষ্ণাদ্বাদশীর সন্ধ্যা। আলোর আভাস জেগেছে কিন্তু সেই আলো গাছের পাতায় আটকে যাচ্ছে তবু তারি ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলো-আঁধারের আভাস জেগেছে, তাতেই পথ দেখে দেখে এগিয়ে চলেছে দুই অশ্বারোহী। ক্রমে নারিকেল কলা গাছের প্রহরা ঘেরা গ্রাম বসত পার হয়ে বিশাল প্রাকার বেষ্টিত নগরীর প্রধান ফটকে এসে পড়েন তাঁরা। রাজদূত দুর্গফটকে অভিজ্ঞান প্রদর্শন করে প্রবেশ করেন; সঙ্গে রঘুনাথ। দুর্গফটকের মাঝখানে বেশ খানিকটা প্রশস্ত চত্বর। সেইখানে অশ্বরক্ষক ওদের অশ্ব দুটিকে নিয়ে যায়, তারা পাথুরে মাটিতে পা ঠোকে। পদব্রজে কিছুটা অগ্রসর হ'তেই রাজপ্রাসাদ চোখে পড়ে। অলিন্দে-অলিন্দে, কক্ষে-কক্ষে, বহির্দ্বারে ইতিমধ্যে বাতি জ্বেলে দিয়েছে বাতিদার। সেই রাজদূতের সঙ্গে মন্ত্রণা কক্ষের দিকে এগিয়ে চলেন রঘুনাথ। চারিদিকে মুক্ত খঞ্জর হাতে প্রহরীর দল। সুন্দর কক্ষ। মূল্যবান কার্পেটে মোড়া কক্ষতল। চারিদিকে রঙিণ ঝালর। মূল্যবান কিংখাবে মোড়া আসনে রাজা নৃসিংহদেব বসে আছেন। এখানেও মুক্ত খঞ্জর হাতে প্রহরীর দল নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। তালপত্র নির্মিত ময়ূরপুচ্ছ শোভিত নানা রঙে চিত্রিত বিশাল দুখানি ব্যজন দু হাতে ধরে দুইপাশে দুইজন অনিন্দ্যসুন্দরী নারী। মাল্যচন্দন অঙ্গরাগে বিভূষিতা দেহে যৌবনের জোয়ার অঙ্গে অঙ্গে লহরী তুলে খেলা করে বেড়াচ্ছে। খুশী মনে নরম গদির উপর সোজা হয়ে বসলেন রাজা নৃসিংহদেব। বৃদ্ধ হলেও যথার্থ বীরের মতোই দেখাচ্ছিল তাঁকে। বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু বলা যায়। বলিষ্ঠ, দীর্ঘদেহ।

নত হয়ে অভিবাদন করেন রঘুনাথ—প্রদ্যুম্নপুরাধিপতি রাজা নৃসিংহদেব আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

—এসো রঘুনাথ। সুস্বাগতম।—রাজা নৃসিংহদেবের কণ্ঠস্বর অতিশয় গম্ভীর। ডান হাত তুলে তিনি ইঙ্গিত করতেই মন্ত্রণাকক্ষ খালি করে একে

একে সবাই বাইরে চলে যায়। সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্রি নামল। নিস্তব্ধ চারিদিক। রক্ষীর পদশব্দ ব্যতীত আর কিছু শোনা যায় না।

গম্ভীর অথচ আন্তরিকতাপূর্ণ কণ্ঠে রাজা বললেন।

—আমার পাশে বিশ্বস্ত পুত্রের মত তোমাকে আমি চাই রঘুনাথ।

—মহারাজ!—নতনমু কণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ করেন রঘুনাথ।

হ্যাঁ; তার আগে জানতে চাই কতদূর পর্যন্ত তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি?

—আপনি আমার পরীক্ষা নিন মহারাজ, আমি জীবনের বিনিময়ে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চেষ্টা করব।

আসন ছেড়ে উঠে এলেন রাজা। বিশাল বক্ষ চাপা উত্তেজনায় ওঠানামা করছে। গরম নিশ্বাস পড়ছে। বাহু প্রসারিত করে আলিঙ্গনে টেনে নিলেন তিনি রঘুনাথকে।

—প্রাণাধিক পুত্র আমার। আমি বিশ্বাস করি আমার রাজ্যে যে অন্ধকার নেমে আসছে সেই অন্ধকারে তুমি আলো জ্বালাতে পারবে। আমি শুনেছি তুমি নিজস্ব একটি গেরিলা বাহিনী তৈরী করেছ যা এখনও সৌখিন খেলাঘরের খেলায় রত, কিন্তু প্রয়োজনে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠতে পারে। আমি তোমার সব খবর নিয়েছি। তুমি বীর। আমি পুত্রহীন। কন্যা চন্দ্রকুমারী আমার একমাত্র কন্যা। আমার প্রধান সেনাপতি কংসারী চারিদিকে জাল ফেলে এক সর্বনাশা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টায় সে রত। রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্যগণকে সে উৎকোচে বশীভূত করেছে। এই অবস্থায় আমি কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিনে। এক্ষণে বাইরের একটি শক্তি যদি আমার পাশে পাই তবে হয়তো···।

আপনি আশ্বস্ত হোন মহারাজ। আমি আমার জীবন দিয়েও আপনার আদেশ পালন করব,—নত হয়ে রাজার পাদস্পর্শ করে প্রণাম করেন রঘুনাথ। আর একবার মস্তক স্পর্শ করে চুম্বন করেন রাজা। করতালি দিয়ে প্রতিহারি আহ্বান করেন। হুকুম দেন,—ভাস্কর সিংহ।

প্রতিহারির সঙ্গে ভাস্কর সিংহ মন্ত্রণা কক্ষে প্রবেশ করে রাজাকে অভিবাদন করেন। প্রতিহারি চলে যায়।

ভাস্কর সিংহের দিকে তাকান রঘুনাথ। এ সেই রাজদূত। রাজার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকান ভাস্কর সিংহ। হেসে ওঠেন রাজা।

—আমরা রঘুনাথকে পেয়েছি ভাস্কর। এবার তোমরা যাত্রা কর। সাবধান পরিকল্পনা যেন প্রকাশ না পায়। আর একবার আশীর্বাদ করে মন্ত্রণা কক্ষ ত্যাগ করেন রাজা। বারেকের জন্য ভাস্কর সিংহ এবং রঘুনাথ আলিঙ্গনাবদ্ধ হন।

পরক্ষণেই বাইরে বেরিয়ে আসেন। প্রাসাদ উদ্যানে ফুলগাছগুলিতে রাত্রের অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। আকাশে কে যেন মুঠোমুঠো জোনাকীর ফুল ছিটিয়ে রেখেছে।

প্রধান ফটক বন্ধ। দুর্গরক্ষীকে রাজনামাঙ্কিত অভিজ্ঞান দেখিয়ে চাতাল থেকে অশ্ব নিয়ে নগরীর বাইরে বেরিয়ে আসেন তাঁরা। পূর্ব পরিকল্পনা মত রঘুনাথকে এখনই প্রকাশ করতে চায় না ভাস্কর সিংহ। পিছনে বিরাট সিংদরজায় অস্ত্রধারী প্রহরীর দল। দরজার চাতালের উপর থেকে বাতিটা ঝুলছে। কাল জমাট-বাঁধা প্রাকার শ্রেণী পিছনে ফেলে অন্ধকারের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন ভাস্কর সিংহ ও রঘুনাথ।

—বিদায় বন্ধু। ভাস্করের দক্ষিণ হাত স্পর্শ করে বলেন রঘুনাথ।

—আবার দেখা হবে। রঘুনাথের হাতে মৃদু ঝাঁকানি দেন ভাস্কর সিংহ।

স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে অশ্বারূঢ় রঘুনাথ নিমেষে ডুবে যান বনানীর মধ্যে। রাত্রির তৃতীয়যামে অশ্বক্ষুরধ্বনি দ্রুত মিলিয়ে গেল। ধীর পদে প্রাসাদ দুর্গে ফিরলেন ভাস্কর সিংহ।

কৃশ চন্দ্রলেখার কিরণে ক্লান্তা নিশীথিনী, চন্দ্রমা পশ্চিমাচলমুখী। নিশাবশেষ ধীরে ধীরে ম্রিয়মাণ হয়ে আসছে, লতাকুঞ্জ তরুক্ষীর-গন্ধ সবুজে সমাকীর্ণ বনপথে ধীরে ধীরে অশ্বচালনা করছেন রঘুনাথ। আকীর্ণ বনভূমিতে যেন অমরতার আনন্দ ফুটে রয়েছে। জরা নেই, জীর্ণতা নেই, যৌবন এখানে চিরসরসিত। ধীরে ধীরে এক বিশাল অশ্বত্থ তলে এসে দাঁড়ান রঘুনাথ। উৎকলিকা কিশলয়ের পাশ থেকে নীহারবিন্দু তাঁর মাথার উপর ঝরে পড়তে থাকে। যেন কার করুণাপূত স্নিগ্ধ হাতের স্পর্শ। মুখ তুলে তাকান রঘুনাথ, অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে বিপুল পিপাসিত অন্তরে দুই হাত প্রসারিত করে বক্ষস্পর্শ করেন সেই অশ্বত্থ তরুকাণ্ডে। এইতো সেই অশ্বত্থতরু, সেই ছায়াতল। যেখানে একদিন এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর পিতা; তাঁর মাতার দেহস্পর্শপূত তরুতলের এই দূর্বামঞ্জরী। সস্পৃহ হৃদয়ে স্তবকিত দূর্বামঞ্জরীর গুচ্ছের উপর লুটিয়ে পড়েন রঘুনাথ। মাতৃদেহ রক্তপূত স্পর্শের পুলক তাঁর বক্ষে সঞ্চালিত হতে থাকে।

ঊষাগমে প্রাচী কপোল অরুণিত হয়, সেই যে কবে রাজপুতানার জয়পুর রাজ্য থেকে এক তীর্থ যাত্রীদলের সঙ্গে পূর্ণগর্ভা এক রমণী স্বামীর সঙ্গে জগন্নাথ দর্শনের আশায় পদযাত্রা করেছিলেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন এই রাজপুত রমণী। জগন্নাথের আশীর্বাদে তাঁর গর্ভস্থ সন্তান এক বিশাল রাজ্যের অধিশ্বর হবে। তাই অনাগত সন্তানের আগমন ধ্বনি আপন শরীরে স্পর্শিত হতেই ব্যাকুলিত-

চিন্তা মাতা সন্তানের জন্য মঙ্গল আহরণের উদ্দেশ্যে স্বামীর হাত ধরে তীর্থের পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

সুদূর পথ।

জঠরের সন্তানকে শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যেতে পারেন নি আসন্ন-প্রসবা জননী। বাধ্য হয়েই যাত্রীদল থেকে পিছিয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। অনন্যোপায় দম্পতী এই অরণ্যে এই অশ্বত্থতলে আশ্রয় নেন। রাত্রি শেষের অন্ধকার। শুকতারার আলোক। মাতার আরক্তিম কপোলে স্বেদাঙ্কুরকণা ফুটে ওঠে। নিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হয়, উদ্ভিন্ন শতদলের মত বিকশিত হয়ে পুষ্পিত হতে চায় যৌবন-বেদনা। ব্যস্ত হয়ে ওঠেন অনভিজ্ঞ পিতা। কটিতটে প্রকম্পিত জয়শঙ্কর নামক তাঁর প্রিয় তরবারিটি একবার স্পর্শ করেন আবার ছুটে যান প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছে। তরঙ্গের ক্রীড়নকের মত মনের দুর্দম অস্থৈর্য বোধ করেন তিনি। স্বামীর হাত আরো কঠিন আগ্রহে চেপে ধরে যৌবন শোণিতে প্রথম মধুরতার পুলকে স্ফুটিত করুণার এক রক্তকমল উপহার দেন জননী। নিস্তব্ধ অন্ধকারে বাতাস হঠাৎ বীতনিদ্র বিহগের রবে চঞ্চল হয়, মুখরিত হয় সদ্যোজাত শিশুর কোমল কণ্ঠরবে। কুসুম কোরকের মত সদ্যোজাত শিশুর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে আনেন পিতা। একটি ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ডের ধুক ধুক শব্দ যেন শোনা যায়, ক্ষুদ্র ছন্দে স্পন্দিত ছোট ছোট শ্বাসবায়ুর মৃদু উত্তাপ তাঁর মুখে এসে লাগে।

হঠাৎ চমকে ওঠেন তিনি। ব্যথিত দুই বাষ্পান্বিত চক্ষু অপলক হয় দুর্বা মঞ্জরীর উপর শায়িতা প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুনীল মুখমণ্ডলের উপর। ভোর হয়ে গিয়েছে। সুন্দর তনু চন্দ্রমুখী প্রিয়ার নীরব অন্তর্ধানে তাঁর ইহকালের সকল অদৃষ্ট হাহাকার করে ওঠে। দুর্বহ বেদনাভারে বিহ্বল শূন্য বক্ষের অশ্রুস্রোত ভ্রমর-জল্পিত বনানীর মধ্যে, শান্ত তরুতলে, স্তবকিত দুর্বাদলের উপর ঝ'রে পড়ে। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে থাকেন তিনি তারপর তাঁর বৈরাগ্য বিধুর অন্তর উৎকর্ণ হয়ে সুদূরের আহ্বান শুনতে পায়। নিজের পরিচয়লিপি আর মন্ত্রপূত তরবারি 'জয়শঙ্করকে' সদ্যোজাত শিশুর শিয়রে রেখে শরাহত হরিণের ত্রস্তগতি ছায়ার মত অরণ্যের দিকে চলে যান তিনি উদভ্রান্ত অশান্ত দাবানল তাড়িত প্রাণীর মত।

চলে গেলেন।

আর ফিরলেন না।

বনতলে সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দন শোনা যায়, বৃক্ষচূড়ায় সদ্যোজাগ্রত বিহঙ্গের কাকলী জাগে। অরুণ চুম্বিত রাগ রেখা ফুটে ওঠে বনশীর্ষে।

এদিকে বনপ্রান্তে লাউগ্রামে এক কুটীর থেকে কৃষক রমণী কমলা বনভূমির

প্রান্তদেশে কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য এসে সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি শুনতে পেয়ে, বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে অরণ্যক্রোড়ের নিভৃতে পথরেখার উপর এসে দাঁড়ায়। দেখতে পায় বৃক্ষতলে ভূমি-শয্যার উপর চিরনিদ্রায় নিদ্রিতা এক পূর্ণিমার কমল। তাঁর ভূমি লুণ্ঠিত অঞ্চল প্রান্তের উপর ক্রন্দনরত হতভাগ্য এক শিশু। বিপুল বিস্ময়ে স্তম্ভিত কমলার হৃদয় করুণায় স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। উন্মত্ত পিপাসার মত দুই ব্যগ্রহাতে বিপুল আগ্রহে সেই শিশুকে বুকের উপর তুলে নেয় কমলা। সেই মুহূর্তে পুত্রহীনা কমলার মনে হয় সন্তানহীন অনন্ত আয়ুর চেয়ে সন্তান-প্রণয়ে বিলীন একটি মুহূর্তের জীবনও প্রিয়তর।

অরণ্যের প্রান্ত অতিক্রম করে অগ্রসর হয় কমলা। স্রোতস্বিনীর ক্ষীণ জলরেখা পার হয়ে সুশ্যাম তৃণ-প্রান্তরের পথরেখার উপর দিয়ে শান্ত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে কুটীর অভিমুখে এগিয়ে যায় কমলা। উদ্ভাসিত প্রত্যূষে গ্রামবসত তখন কোলাহলপ্রণাদিত হচ্ছে।

দিন যায়, মাস যায়, বৎসর অতীত হয়। জননী কমলার শূন্য গৃহ পূর্ণ করে তিলে তিলে বাড়তে থাকে সেদিনের সেই শিশু। বনচ্ছায়ার মর্মলোক হতে কুড়িয়ে এনে কমলা অন্তর উৎসারিত সুমন্দ্রিত মন্দ্রস্বরে যার নাম রেখেছে 'রঘুনাথ'।

তন্দ্রা ভেঙ্গে যায় রঘুনাথের। ছায়াতলে তৃণাস্তীর্ণ ভূমির উপর উঠে বসেন তিনি। আলোকে আপ্লুত হয়ে উঠেছে পূর্বগগনের ললাট। অশ্বারূঢ় হন রঘুনাথ। সবুজাকীর্ণ অরণ্যবলয় বেষ্টিত তৃণভূমি পার হয়ে গ্রামাভ্যন্তরে জননীকুটীরের আঙ্গিনায় বকুল বীথির নীচে অশ্ব ত্যাগ করেন রঘুনাথ। ইতিমধ্যে কুটীর প্রাঙ্গণে লাউগ্রামের তরুণের দল রঘুনাথের জন্য প্রতীক্ষা করছে। ঝঞ্ঝাতাড়িত মেঘখণ্ডের মত চঞ্চল ছিল তাদের মন। পর্ণতরুর ছায়া আর শ্যামলতায় বেষ্টিত জননীকুটীর প্রাঙ্গনে প্রিয়দর্শী তরুণ রঘুনাথকে ঘিরে অনুসন্ধিৎসায় মুখর হয় তরুণদল।

—রাজা কেন ডেকেছেন ?

—তোমায় কি অপমান করেছেন রাজা ?

ঘুরে দাঁড়ান রঘুনাথ। তাঁর বিকচ আননশোভার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয় তরুণদল।

—না—তোমাদের আশঙ্কা অমূলক। অনেক কাজ। অনেক দায়িত্ব বহন করে এনেছি। দুরূহ সেই কর্তব্য সাধনে তোমরা আমার পাশে থাকবে।

—আমরা প্রস্তুত। অঙ্গীকার দৃঢ় কণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারণ করে তরুণের দল।

পিতার সঙ্গে আলোচনা করে সকল কর্তব্য স্থির করা হবে। তার পূর্বে আজকের উৎসব তোমরা সম্পন্ন কর।—রঘুনাথের আহ্বানে কর্তব্যচঞ্চল হয়ে ওঠে তরুণের দল। ইতিমধ্যে জননী কুটীরে লতাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে গ্রামবধূগণ মৃত্তিকালেপন, আলিম্পনাদি কাজে ব্যপৃত হয়। কুটীরের সম্মুখে বনবীথিকার প্রশস্ত অঙ্গনে রন্ধনের আয়োজনে, কুটীরাভ্যন্তরে প্রার্থনাগীতির প্রস্তাবনায় ব্যাপৃত হয় সকলে। সমস্ত লাউগ্রামবাসী আজ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করবে।

আজ এই দিনটি রঘুনাথের জননী কমলার প্রয়াণতিথি।···আজ থেকে ঠিক আট বৎসর পূর্বে রঘুনাথকে পুনর্বার মাতৃহারা ক'রে চিরবিদায় নিয়েছিল কমলা। যে মহাপ্রাণ রঘুনাথকে বনতল থেকে কুড়িয়ে এনে অপার স্নেহে বক্ষে স্থান দিয়েছিল। অনাথ শিশুকে দিয়েছিল মাতৃক্রোড়। মাতৃস্নেহ চুম্বনে সিক্ত করেছিল শিশু রঘুনাথের ক্ষুদ্র দুটি অধর। সেই জননী কুটীর রঘুনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র। উপবাসশুদ্ধ, স্নানস্নিগ্ধ, সুকঠোর ব্রত রঘুনাথ অর্ঘমাল্য ধূপদীপের উপাচার নিয়ে প্রতি বছর যখন শ্রদ্ধা জানায়, মনে হয় রঘুনাথের, প্রয়াতা জননী যেন কুটীরের অভ্যন্তর থেকে অদৃশ্য দুই চক্ষুর দৃষ্টি মেলে আশীর্বাদের আবেগে তাকে স্নিগ্ধ করেন। মাতৃস্পর্শে যেন প্রলিপ্ত হয় রঘুনাথের মন। মনে পড়ে রঘুনাথের, মৃত্যুর ঠিক দুইদিন পূর্বে রঘুনাথের হাত ধরে সন্তানের উত্তরজীবনের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের কামনায় গ্রামের সমৃদ্ধ গৃহী পঞ্চানন ঘোষালের গৃহে এসে দাঁড়িয়েছিল কমলা। আকস্মিক রূঢ় এক বিস্ময়ের আঘাতে চমকে উঠেছিল কিশোর রঘুনাথ। মাতা কমলা পঞ্চানন ঘোষালের হাতে তাকে সঁপে দিয়ে বলেছিল।

—আমি বুঝতে পারছি। আমি আর এ পৃথিবীতে থাকবনা। তুমি আমার সন্তানকে নাও ঠাকুর। ওকে তোমার কাছে রাখ।—দুই চোখে যেন তপ্ত বালুকার দংশন ছুটে এসে লেগেছে, চকিতে মাথা হেঁট করে আত্মসংবরণ করে কমলা।

সেদিন শিশির ঋতুর হিম-পীড়িত স্তব্ধ তরুর মত নীরবে দাঁড়িয়েছিল বালক রঘুনাথ।

পঞ্চানন ঘোষাল ঠেলে ফেলেননি কমলার আকুতি। জননী কমলার আয়তনয়নের দৃষ্টি ক্ষণিকের মত বিহ্বল হয়ে ওঠে অপরিসীম কৃতজ্ঞতায়।

সেইদিন থেকে পালকপিতা পঞ্চানন ঘোষালের গৃহে আশ্রয় হয় রঘুনাথের।

নিজ কুটীরে ফিরে যায় কমলা। উপাসিকা কমলা তার রঘুনাথের কল্যাণের আশা-প্রসন্ন মন নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কুটীরের সর্বত্র কিন্তু তবু নিশাগমে শয়ন করতে পারে না রঘুনাথহীন শয্যায়। অবশেষে অবসন্নদেহে মৃত্তিকার

উপর সুস্মিত ওষ্ঠে ঘুমিয়ে পড়ে। সে ঘুম আর ভাঙে না। বেদনাহত চিত্তে এই নির্মম সংবাদ শোনে কিশোর বালক রঘুনাথ। এমন বেদনা আর পান নি রঘুনাথ। সমাজের জন্য নয়, সংসারের জন্য নয় শুধু মাতৃহীন মাতৃকুটীরে মাতৃসৌরভে আজও তাই আপ্লুত হন রঘুনাথ।

ধীরে ধীরে মাতৃকুটীর মুখরিত হয়ে ওঠে। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সমবেত হয়ে পংক্তি ভোজনে যোগ দেয়। তাদের সকলের প্রিয় রঘুনাথের দীর্ঘ জীবন কামনা করে প্রয়াতা কমলার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করে ফিরে যায় তারা আপন আপন গৃহে।

অবশেষে বনবীথিকায় ভ্রমর গুঞ্জিত তরুছায়ে সঙ্গীদের নিয়ে পংক্তি ভোজনে বসেন রঘুনাথ। কুটীরাভ্যন্তরে পালকপিতা পঞ্চানন ঘোষাল সমবয়সীদের নিয়ে বিশ্রামালাপ করছেন। তাঁর পুত্রগর্বে গর্বিত ললাটে তীক্ষ্ণ বলিরেখা স্মৃতিচারণে উদ্দীপ্ত। তাঁর আর্ধনিমীলিত চোখের উপর কিশোর রঘুনাথ ভেসে বেড়ায়। এইতো সেদিন গোচারণ ক্ষেত্র থেকে রঘুনাথকে ফিরতে না দেখে উৎকণ্ঠিত পঞ্চানন ঘোষাল গ্রাম প্রান্তে ক্ষীণ স্রোতস্বিনী পার হয়ে সবুজে সমাকীর্ণ বনভূমির মধ্যে অন্বেষণ করতে করতে এক বৃক্ষমূলে এসে দাঁড়ান। দেখতে পান, মুক্ত আকাশের নীচে একটি অপ্রশস্ত চাতালে দুর্বাস্তবকের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে রঘুনাথ। রোমাঞ্চিত দেহে তিনি লক্ষ্য করেন তরুগাত্র হতে স্খলিত সূর্যালোক থেকে কিশোর রঘুনাথের মুখমণ্ডল আড়াল করে এক বিশাল ফণিনী ফণা বিস্তার করে রয়েছে। সেইদিন নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁর মনের উপর রাজতিলকে দেদীপ্যমান ললাট কিশোর রঘুনাথের এক দীপ্ত অবয়ব ক্ষোদিত হয়ে যায়। বিশ্বাসে দৃঢ় হয় তাঁর মন। রঘুনাথ। তাঁর রঘুনাথ নিশ্চয়ই হবে কোন এক দিকপাল।

ভাবতে থাকেন পঞ্চানন ঘোষাল। স্ফুট প্রসূনের নব-পরাগের মত এক সুরভিত সম্ভাবনার প্রত্যয় সকল সময়ের জন্য তার বাসনাকে উদ্দীপ্ত করে রেখেছে। কিছুমাত্র সংশয় নেই তাঁর মনে। রঘুনাথ নিশ্চয়ই হবে কোন রাজাধিরাজ নইলে ঈশ্বরের একি অপরিসীম কৌতুক। সেই বর্ষণ মুখরিত রাত্রির অসম্ভব ঘটনা তাঁর মনে আর একবার সঞ্চালিত হয়। সেদিন বর্ষণসিক্ত গ্রাম-প্রান্তে দুই কলস্বরা স্রোতস্বিনীর মোহনায় সঙ্গীদল নিয়ে মৎস্য শিকারে গিয়েছিলেন রঘুনাথ। জাল ফেলে সকলেই; মৎস্য শিকার হয়। আচম্বিতে রঘুনাথের জালে নিবদ্ধ হয় এক সুবর্ণ পেটিকা। পেটিকা উন্মুক্ত করে নিঃশব্দ রঘুনাথ চমকে ওঠেন। গৃহে পিতার কাছে বহন করে আনেন সেই সুবর্ণ পেটিকা।

রাজ সম্পদ। সংখ্যাহীন স্বর্ণপিণ্ড!

ঘোর কৃষ্ণ প্রস্তরে খোদিত এক শালগ্রামশীলা !

গ্রাম প্রান্তে বনভূমির বক্ষের তৃণাঙ্কুর, বারিস্নানে বৈদুর্যমণির মত ফুটে ওঠে। গৃহমধ্যে বিপুল বিস্ময়ে পিতা পঞ্চানন প্রত্যয়তৃপ্ত নয়নে আবেগ কম্পিত বাহু প্রসারিত করে রঘুনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

বিনম্র কণ্ঠস্বরে যেন ধ্যান ভঙ্গ হয় ঘোষালের।

—ক্ষমা করুন পিতা। আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতে বাধ্য হচ্ছি। কিছু মন্ত্রণা আছে।

বনবীথিকায় পংক্তি ভোজন সাঙ্গ করে সঙ্গীদল নিয়ে কখন দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন রঘুনাথ তা বুঝতে পারেন নি তিনি।

একে একে কুটীর শূন্য করে বিদায় নেয় অভ্যাগতের দল। কেবলমাত্র কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে পিতার কাছে এগিয়ে আসেন রঘুনাথ।

—আজকের রাজসম্ভাষণের পর্যালোচনা করে মন্ত্রণার প্রয়োজন পিতা।

মুখ তুলে তাকান পালকপিতা পঞ্চানন। জীবনের আবর্তে তাঁর অভিজ্ঞতা-লব্ধ আননে উজ্জ্বল চক্ষুতারা। তাঁকে ঘিরে সকলে উপবেশন করেন।

মাতৃকুটীরের দ্বার রুদ্ধ হয়।

দিবাবশেষ ধীরে ধীরে ম্রিয়মাণ হয়ে আসছে। কানাই সায়র সংলগ্ন রাজোদ্যানের নিকুঞ্জের নিভৃতে পুষ্পপ্রেঙ্খায় দোলায়িত রাজকুমারী চন্দ্র, প্রাসাদের নিবিড়-ধবল শিখর-কেতনের দিকে আনমনে তাকিয়ে আছে। বসন্ত সমীরের স্পর্শে চঞ্চলিত পুষ্প পল্লব। দোলে রাজদুহিতা চন্দ্রকুমারী। যৌবন বন্যায় ধীরে ধীরে নিজের অগোচরে কবে প্লাবিত হয়েছে দেহতট অনুভব করতে পারে নি চন্দ্রকুমারী। বিস্মিত হয় চন্দ্রকুমারী। মনের গভীরে যে স্বপ্ন ঘুমিয়েছিল সেই স্বপ্ন আজ তার শোণিতের উত্তাপে তরলিত স্রোতের মত সারা অঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে।

কে সে? প্রশ্ন মনে জাগলেও তার পরিচয় অনুমান করতে পারে না চন্দ্রকুমারী। ক্ষণিক তরঙ্গের মত প্রাসাদ অলিন্দে আসন্ন সন্ধ্যালোকে প্রাচীর গাত্রের দীপাধারের সম্মুখ দিয়ে যাবার সময় শয়নকক্ষের গবাক্ষপথে শুধু একবার বারেকের জন্য তাকে দেখেছিল চন্দ্রকুমারী, নয়নাভিরাম। তারুণ্যোমণ্ডিত প্রিয়দর্শন। উদ্ধত চিবুক দীপালোক-চুম্বনে রঞ্জিত। ওষ্ঠাধরে সমুদ্রের কামনা স্পন্দিত। নীলিমা প্লাবিত নয়ন।—কিন্তু কে সে?

পুষ্পপ্রেঙ্খা থেকে নেমে চলেই যাচ্ছিল চন্দ্রকুমারী, কিন্তু যেতে পারে না। উদ্যানের পথ ধরে কে যেন এগিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে এক নারী। পথের উপর দাঁড়িয়ে থাকে রাজকন্যা। পরক্ষণেই চিনতে পারে

চন্দ্রকুমারী। কিঙ্করী প্রমদা, একটি পুষ্প স্তবক তার হাতে দিয়ে অভিবাদন করে মৃদু পায়ে প্রস্থান করে। দূরে দেবালয় হ'তে আরত্রিক স্তোত্রের সুস্বর তরঙ্গিত হয়ে ভেসে আসে। নিজের অজ্ঞাতসারে চন্দ্রকুমারীর কম্পিত অধরে অস্ফুট স্বরে প্রার্থনার বাণী গুঞ্জরিত হয়।

—আমার তৃষ্ণা বিদূরিত করে তাকে একবার দেখাও প্রভু।—রাজউদ্যানের কোমল দূর্বাস্তবকের উপর ধীরে ধীরে পা ফেলে প্রাসাদে ফিরে যায় রাজদুহিতা। শয়ন কক্ষে পুষ্পাধারে পুষ্পস্তবকটি রাখতে গিয়ে লক্ষ্য করে চন্দ্রকুমারী পুষ্পস্তবকের মধ্যে একখানি পত্র সংযোজিত রয়েছে। ধীরে পত্র উন্মুক্ত করে রাজকন্যা চন্দ্রকুমারী। তার নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হয়। তিলপর্ণীর তিলক অঙ্কিত ললাট কুঞ্চিত হয়। বৈশাখী ঝঞ্জার ক্রুদ্ধ নিঃস্বন যেন নিকটতর হয়ে আসে। ভ্রূভঙ্গী উদ্ধত করে জীর্ণ পত্রের আবর্জনার মত পত্রখানি নখরদংশনে ছিন্ন করে সেই পুষ্পস্তবকের মধ্যেই ফেলে দেয় কুমারী চন্দ্র। কক্ষের বহিঃদ্বারে এসে চিৎকার করে ডাক দেয় রাজকুমারী।

—প্রমদা।

কক্ষান্তর হ'তে ছুটে আসে কিঙ্করী প্রমদা।

—এ কোন উন্মাদের পত্র বহন ক'রে এনেছিস?

—আমি কেবল পুষ্পস্তবক বহন ক'রে এনেছি রাজকুমারী। যন্ত্রস্ত স্বরে বলে প্রমদা।

—কার কাছ থেকে বহন ক'রে এনেছিস এই পুষ্পস্তবক? দুই কজ্জলিত খরনয়নের দীপ্তির সম্মুখে সন্ত্রস্ত প্রমদা।

—সেনাপতি কংসারী আপনাকে দেবার জন্য এই পুষ্পস্তবক আমার হাতে দিয়েছিলেন রাজকুমারী।

—কংসারী!—চিৎকার করে ওঠে চন্দ্রকুমারী। তার সুন্দর দুই চক্ষু হঠাৎ হিংস্র হয়ে ওঠে।—সে নির্বোধকে জানিয়ে দে। নৃসিংহনন্দিনী চন্দ্রকুমারীর পদপ্রক্ষালনের জন্য কোন কিঙ্করের প্রয়োজন নেই।

চন্দ্রকুমারীর বিদ্রূপকুটিল দৃষ্টির সম্মুখে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না কিঙ্করী প্রমদা। সভয়ে পিছিয়ে এসে প্রস্থান করে প্রমদা।

ঠিক সেই মুহূর্তেই রাজসেনাপতি কংসারীর গৃহে রুদ্ধদ্বার মন্ত্রণা চলছিল। ঘোতবিহারের সামন্ত নৃপতি প্রতাপনারায়ণের এক দূত ও রাজসেনাপতি কংসারীর মধ্যে। সকলের অলক্ষ্যে বিদ্রোহের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল।

স্বপ্ন দেখে সেনাপতি কংসারী, ঘোতবিহারের প্রতাপনারায়ণের সাহায্যে বিদ্রোহ করে প্রদ্যুম্নপুরের রাজসিংহাসন তার করতলগত হবে। তার লালাসিক্ত ওষ্ঠে, লালসাসিক্ত নয়নের কোণে ভেসে ওঠে চুরি করে দেখা রাজোদ্যানের কুঞ্জে পুষ্প

প্রেক্ষায় মদালস মদির কামনার ছায়া ঢাকা, সদ্যস্নাতা রাজদুহিতা চন্দ্রকুমারীর নিঃশ্বাসে ফুলে ফুলে ওঠা দুটি অসাবধানে অনাবৃতা স্তনাগ্রচূড়া, উদ্ধত স্তনে অবহেলায় ক্রীড়ারত লোভী প্রজাপতি। মুদ্রিত কজ্জলিত নয়ন, ঘনকৃষ্ণ কেশে মলয় হিল্লোল। দেখতে দেখতে সেদিন অসংযমী অশান্ত লালসা সংযত করতে নিজের বাম হাতের মণিবন্ধ দংশন করে রক্তাক্ত করেছিল কংসারী।

হা হা করে হেসে ওঠে কংসারী।

অনেকক্ষণ আগেই যোতবিহারের দূত কক্ষত্যাগ করে চলে গিয়েছে। কক্ষের বাতায়নে এসে দাঁড়ায় কংসারী। সন্ধ্যা হয়েছে। দীপ জ্বলে নগরীর গৃহে গৃহে। রাজপ্রাসাদের শিখরকেতনের দিকে তাকিয়ে কক্ষাভ্যন্তরে প্রসাধনরতা যৌবনময়ী রাজকুমারীর কথা ভাবতে থাকে সেনাপতি। তার ভ্রূকুটি কুটিল ললাটের বলিরেখায় ওষ্ঠের কোণে বক্র হয়ে মৃদু ক্রূর হাসি ফুটে ওঠে। হোলি উৎসব সমাপন করে মৃগয়াভিলাষে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীদের নিয়ে বনগমন করবেন রাজা নৃসিংহদেব। সেই সুযোগে প্রতাপনারায়ণের সৈন্যবাহিনী অতর্কিতে বিনা বাধায় আক্রমণ করবে প্রাসাদ দুর্গ। প্রাসাদরক্ষীদের আর্তনাদে আর হাহাকারে রহস্যময় হয়ে উঠবে প্রদ্যুম্নপুরের রাজগৃহ। এইখানে এই বাতায়নে দাঁড়িয়ে সেই আর্তনাদ শুনবে কংসারী। অবশেষে শোণিতে ও দীর্ঘশ্বাসে ভরা প্রাসাদদুর্গের অলিন্দ পার হয়ে রাজকুমারী চন্দ্রের শয়নকক্ষে এসে দাঁড়াবে কংসারী। একটিমাত্র ইঙ্গিতে তার নিজস্ব সৈন্যবাহিনী প্রাসাদদুর্গ অধিকার করবে। হঠাৎ আপন মনেই হেসে ওঠে রাজসেনাপতি।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। রাজপথের আলোকজ্জ্বল বিপণীশ্রেণী ত্রস্ত পদে পার হয়ে যাচ্ছে এক আগন্তুক। অবশেষে পুরদ্বার পার হয়ে নগরীর প্রান্তে ক্ষীণ স্রোতস্বিনীর সন্নিকটে এসে দাঁড়ায় সে। পরপারে নবোদ্গত কিশলয়ে সমাকীর্ণ তরুরাজির অন্তরালে তার অশ্ব বাঁধা ছিল। অঞ্জলি ভরে জলপান করে তৃষ্ণা দূর করে স্রোতস্বিনী পার হয়ে অশ্বের কাছে এসে নিশ্চিন্ত হয় আগন্তুক।

যোতবিহার এখান থেকে চার যোজন পথ।

এই আগন্তুককেই সেনাপতি কংসারীর ভবন থেকে চুপিসারে বের হ'তে দেখেছিল কিঙ্করী প্রমদা। আজ সায়াহ্নে পুষ্পকাননে সেনাপতির অনুরোধেই পুষ্পস্তবক দিয়ে এসেছিল সে রাজকুমারী চন্দ্রের হাতে। নিরপরাধিনী প্রমদার অগোচরে ঐ স্তবকের মধ্যে একটি লিপিকা গ্রথিত করে দেওয়া হয়েছে। প্রিয় সহচরী রাজনন্দিনী চন্দ্রকুমারীর কাছে তিরস্কৃত হয়ে অভিমানক্ষুব্ধা প্রমদা সেনাপতি ভবনে আসছিল এই ঘৃণ্য কৃত্যের জন্য অন্তত একটা প্রতিবাদ করে হাল্কা

হওয়ার জন্য। কিন্তু অপরিচিত মুখ আগন্তুকের ত্রস্ত পদসঞ্চার প্রমদাকে সন্দিগ্ধ করে তোলে। সন্দেহ দোলায় দুলতে দুলতে প্রাসাদে সখী চন্দ্রকুমারীর কাছেই ফিরে আসে প্রমদা।

—বোধহয় কোন গভীর নতুন ষড়যন্ত্র সূচিত হচ্ছে রাজপুত্রী।

বিরক্তভাবে ভ্রূক্ষেপ করে চন্দ্রকুমারী—আবার কোন দুর্বার্তা নিয়ে এসেছিস প্রমদা?

ক্ষমা কর সখী। পুষ্পস্তবকটি ভাল করে দেখে আনলে আমাকে অপরাধিনী হতে হত না। কিন্তু এর চেয়েও গুরুতর এক সন্দেহ বহন করে এনেছি।

চন্দ্রকুমারীর নয়নে ক্ষরবিস্ময়ের ক্ষণপ্রভা চমকে ওঠে। প্রমদার এমন কণ্ঠস্বর জীবনে এই প্রথম শুনতে পায় রাজকুমারী। বিদ্যুল্লেখার মত স্ফুরিত চাঞ্চল্যে জিজ্ঞাসা করে চন্দ্রকুমারী।

—কি সে সন্দেহ?

—সন্ধ্যাগমে রাজসেনাপতি কংসারীর বাসভবন থেকে অপরিচিত সন্দেহভাজন এক সন্ত্রস্ত আগন্তুককে বেরিয়ে যেতে দেখেছি।

কিছুই ভেবে পায় না রাজকুমারী চন্দ্রকুমারী। স্বর্ণময় পালঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়ায় রাজকুমারী। চোখের দৃষ্টি প্রমদার মুখের উপর নিবদ্ধ করে প্রশ্ন করে।

—তোর কি মনে হয়?

—বলতে সাহস হয় না সখী, তবু আজ বলতে চাই সেনাপতি কংসারী কোন গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। জানি না কোন সর্বনাশ সে করতে চায়।

—তার প্রধান লক্ষ্য বোধ হয় আমি? ভ্রূভঙ্গি উদ্ধত করে প্রশ্ন করে চন্দ্রকুমারী।

—অস্বীকার করার মত মনের জোর পাইনে। তাছাড়া···, ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘশ্বাস ক্ষণিকের জন্য প্রমদার বক্ষবাস কম্পিত করে আবার গোপনে মিলিয়ে যায়।

—তাছাড়া?—রাজকুমারীর ভীরু মুখে সংশয়ের ছায়া পড়ে।

—সেনাপতি কংসারী রাজ্যলোভী।

—প্রমদা! যন্ত্রণাক্ত ধিক্কারধ্বনির মত শোনা যায় রাজপুত্রীর কণ্ঠস্বর।

—তোমার পিতা, আমাদের মহারাজ পূজ্যপাদ নৃসিংহদেবের কাছে একথা অবিদিত নয় রাজকুমারী। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে কিঙ্করী প্রমদা।

—আমি রাজসমীপে চললাম কুমারী।

প্রদ্যুম্নপুরাধিপতি রাজা নৃসিংহদেবের কাছে সংবাদ নিবেদনের জন্য ব্যস্ত-ভাবে চলে যায় কিঙ্করী প্রমদা।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে থাকে চন্দ্রকুমারী। তারপর যেন উৎকর্ণ হয়ে বাতায়নের পাশে দাঁড়িয়ে দূরান্তের বনমর্মর শুনতে থাকে।

দুর্গফটকে যামঘোষী ঘণ্টাধ্বনি বাজে। প্রাসাদশীর্ষে নিভৃতে রাঙ্কবে আবৃত বৃহৎ একটি দারুবেদিকার উপর বসেছিলেন রাজা নৃসিংহদেব ও রাজমহিষী সনকা। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান রচনা করে সম্মুখে সতরঞ্চ বুকের উপর দুই পক্ষের সৈন্য সামন্ত বহন করছিল। মহারাণীর পরণে ঘন লালপাড়ের পট্টবাস। সূক্ষ্ম সূত্রের অবকাশ থেকে দেখা যায় বুকের স্বর্ণহার দীপালোকে চিক্‌চিক্ করছে। কর্ণকুণ্ডলে দোলায়িত মাণিক্য। পট্টবাসের অঞ্চল ভূমিলুণ্ঠিত, খেয়াল নেই। রাজার রণাশ্ব মহিষীর একটি গজকে বেষ্টন করেছে। চেষ্টা করছেন রাণী সনকা, কি করে, কোন উপায়ে গজকে বাঁচান যায়। এমন সময় দ্বারপ্রান্তে এসে দেখা দিল কিঙ্করী প্রমদা।

—ক্ষমা করুন পিতা, বিশেষ সংবাদ বহন করে এনেছি। বিনম্র কণ্ঠে নত হয়ে অভিবাদন করে প্রমদা।

রাজা নৃসিংহদেব ও রাণী সনকা দুজনেই প্রমদার মুখের উপর দৃষ্টি সম্প্রসারিত করেন। সংবাদের গুরুত্ব পরিমাপ করতে চান যেন। উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন প্রিয়তমা একটিমাত্র কন্যা চন্দ্রকুমারীর জন্য। পরক্ষণেই প্রশ্ন করেন মহারাণী।

—তুই কন্যা চন্দ্রের সংবাদ সর্বাগ্রে শুনিয়ে দে প্রমদা।

অকারণ আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিতা জননী কণ্ঠের স্বর মৃদু কেঁপে যায়।

—সখী চন্দ্রকুমারীর জন্য নিশ্চিন্ত হোন মহারাণী। আমি অন্য একটি সন্দেহ বহন করে এনেছি।

শান্তিনিঃসারী দুই চক্ষু নিশ্চিন্ত হয় রাজমহিষীর। পরক্ষণেই কন্যাসমা প্রমদাকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে নেন। গন্ধমাখা অঞ্চলে প্রমদার ক্লান্ত মুখ মুছিয়ে দিয়ে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করেন।

—বল কি সন্দেহ, কার উপর সন্দেহ?

মাতৃস্পর্শে আর্দ্র হয়ে ওঠে আজন্ম মাতৃস্নেহভিক্ষু প্রমদার তৃষিত হৃদয়। চক্ষু বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে।

আবাল্য পালিতা কন্যাসমা কন্যাসহচরী প্রমদার এই ভাবান্তর রাজা নৃসিংহদেবের মনযোগ আকর্ষণ করে। কৌতূহলী হয়ে তিনিও জিজ্ঞাসা করেন।

—কি হয়েছে কন্যা? নির্ভয়ে নিবেদন কর।

—রাজসেনাপতি কংসারী আজ এক অন্যায় আচরণ করেছেন পিতা। আমারই হাত দিয়ে একটি পুষ্পস্তবক রাজনন্দিনী সখী চন্দ্রকুমারীর কাছে পাঠিয়েছিলেন তিনি, আমি বুঝতে পারিনি তার মধ্যে গ্রথিত ছিল একটি পত্র।

কুণ্ঠিত প্রমদা দুই অধরের ভীতি গোপন করতে চেষ্টা করে।

দীপাধারে জ্বলে তৈল দীপ। রাজার চোখ জ্বলে।

—তারপর! সংযত দৃঢ়স্বরে আবার প্রশ্ন করেন—রাজা। বাণবিদ্ধা হরিণীর মত যন্ত্রণাক্ত প্রমদার দুই চক্ষু ভীত হয়ে ওঠে।

—আজ সন্ধ্যায় সেনাপতি ভবনে আমি প্রতিবাদের জন্য অগ্রসর হয়েছিলাম পিতা, কিন্তু সেনাপতি ভবনের দ্বারে পেঁছিতেই সন্ত্রস্ত এক অচেনা আগন্তুককে বেরিয়ে যেতে দেখেছি। তার পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে লুকান তরবারির উজ্জ্বল অগ্রভাগ আমার লক্ষ্যে এসেছে পিতা। এক নিশ্বাসে বার্তা নিবেদন করে যেন নিজ অপরাধ স্খালন করে প্রমদা।

ধীরে উঠে এলেন রাজা, হাত বাড়িয়ে প্রমদার মাথা স্পর্শ করলেন।

—আমাদের অকল্যাণ ভয়ে ভীত হয়েছ কন্যা?—সস্নেহে প্রশ্ন করেন রাজা।

—হ্যাঁ পিতা,—উষ্ণ সলিল ধারায় আপ্লুত হয় প্রমদার নয়ন।

—শান্ত হও। ভয় নেই, তোমারও কোন অপরাধ হয় নি। মূল্যবান বার্তা এনেছ কন্যা; যাও তোমার সখী চন্দ্রকুমারীর কাছে যাও। বিশ্রাম কর।

রাজাদেশে মরালীর মত উৎফুল্লা প্রমদা চলে যায় প্রাসাদশীর্ষ থেকে রাজকুমারী চন্দ্রের কক্ষাভিমুখে।

দারুবেদিকার উপর আবার এসে বসলেন রাজা নৃসিংহদেব।—কি ইচ্ছে হয় জান রাণী? খানিক থেমে আবার বলেন।—ইচ্ছে হয় মুক্ত তরবারি হাতে এখনই গিয়ে কংসারীর ঘাড় থেকে মাথাটা নামিয়ে দিই।

—না রাজা। আপনি চঞ্চল হবেন না। উত্তেজনায় আপনার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কিছু করা অনুচিত রাজা। উপাসিকার মত স্নিগ্ধ শোনা যায় মহিষীর কণ্ঠস্বর।

মৃদু হাসেন রাজা।—ইচ্ছে করলেই সব ইচ্ছে পূর্ণ করা যায় না রাণী। আমার প্রায় সমস্ত সৈন্যই রয়েছে সেনাপতি কংসারীর অধীনে। হঠাৎ যদি।—, রাজার দুই চক্ষুর দৃষ্টি সুতীক্ষ্ম সায়কের মত রাজ্যসীমা পার হয়ে দিগ্‌বলয়ে চন্দ্রালোকিত প্রান্তরের শূন্যতা ভেদ করে ছুটতে থাকে।

—উদ্বেগ দমন করুন রাজা। চিন্তা পরিহার করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। রাণীর বুকের ভিতর নিঃশ্বাসবায়ু ভীরু বেদনায় কেঁপে ওঠে।

প্রশস্ত দারুবেদিকায় রাজা মাথা এলিয়ে দিলেন রাণীর কোমল জানুতে। বললেন,—তোমার হাতখানি আমার কপালে রাখ রাণী।

হাতের পরশে রাণী সনকা অনুভব করেন রাজার বিস্তৃত ললাটে শিরাসমূহ স্ফীত হয়ে উঠেছে। কপাল ঈষৎ তপ্ত।

*　　　　*　　　　*

মধ্যরাতের ঘুমন্ত রাজপ্রাসাদ। শয়নকক্ষের স্বর্ণময় পালঙ্কের বিলাসী সুখশয্যা থেকে উঠে এলেন রাজা নৃসিংহদেব। অন্তঃপুর অতিক্রম করে বহির্দেশে যাওয়ার দ্বারে উপনীত হতেই চারজন প্রহরী এতরাতে মহারাজকে দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণেই নত হয়ে অভিবাদন করে দ্বার খুলে দিল। রাজা নৃসিংহদেব দুর্গফটকে এসে দাঁড়ালেন। রাত্রির নৈঃশব্দে প্রাসাদের রক্ষীদল সচকিত হয়ে উঠলো, তারা মনে করেছিল স্বয়ং মহারাজ আজ বুঝি পরিদর্শনে বেরিয়েছেন।

যামঘোষী ঘণ্টা, ফটকশীর্ষে মধ্যযাম ঘোষণা করল। মহারাজের জনৈক পার্শ্বচর আদেশ পালনের জন্য ঋজু হয়ে মহারাজের সম্মুখে অভিবাদন করে দাঁড়ালেন। দুর্গফটক পরিক্রমা করে কানাই সায়রের সন্নিকটে কারাপ্রাচীরের সম্মুখ দিয়ে হেঁটে গেলেন রাজা। কারা প্রহরীগণ মুক্ত খঞ্জর কটিবদ্ধ করে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করল। মহারাজের দুইজন পার্শ্বচর এবং দুইজন দেহরক্ষী দূরে দূরে মহারাজকে অনুসরণ করছিল। নিশাবসানের এখন অনেক বাকি। উদ্যানের কোকিল কূজন বন্ধ করেছে। প্রাসাদে, কারাকক্ষে, দুর্গফটকে রাজভবনের মন্দুরায় তৈলদীপের আলোকশিখার চাঞ্চল্য ছাড়া আর কোন চাঞ্চল্য কোথাও ছিল না।

প্রাসাদে ফিরে এলেন রাজা নৃসিংহদেব কিন্তু অনুভব করেন মনের গভীরে একখণ্ড বিষণ্ণ মেঘের মত স্তব্ধ দীর্ঘশ্বাস কেন কিসের জন্য বুঝতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বুঝতে পারেন না। ধীরে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলেন তিনি। গন্ধাবারের সৌগন্ধ কক্ষ আমোদিত করছে। অনেকক্ষণ পূর্বেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল রাণী সনকার। শয্যাতলে রাজাকে দেখতে না পেয়ে দ্বারপাল-এর কাছে খোঁজ নিয়ে রাজার বহির্গমনের সংবাদ জানতে পারেন মহারাণী। কিন্তু কারণ অনুধাবন করতে পারেন না, বিস্ময়াবিষ্ট হন, দয়িতবাহুবিচ্যুতা রাণী বেদনার্ত বিরহার্ত নয়নে বাতায়নে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, আলুলায়িত কেশদাম পিঠ ছাপিয়ে নিতম্বে নেমেছে। রাজা তার পার্শ্বে এসে দাঁড়ান। তাঁর দক্ষিণকর রাণীর নরম নধর পিঠে সঞ্চালন করেন। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কোন কথা বলতে পারেন না রাণী সনকা। শুধু নিরবে রাজার বিস্তৃত বক্ষে মুখ ডুবিয়ে দেন, তাঁর শুভ্র গণ্ডদেশে চুম্বন করেন রাজা। প্রাসাদের বাইরে রাজোদ্যানের পল্লবিত দ্রুমবাহু হতে পীতমঞ্জরীর পুঞ্জ লুটিয়ে পড়ে নীচে ধরিত্রীর বুকে।

*　　　　*　　　　*

মন্ত্রীসভার জরুরী বৈঠক আহ্বান করলেন রাজা নৃসিংহদেব। মন্ত্রীরা, প্রধান সেনাপতি কংসারী ও অন্যান্য প্রধান অমাত্যগণ জরুরী আহ্বান পেয়ে দ্রুত

উপস্থিত হলেন। রাজার একান্ত সচীব বীরযোদ্ধা ভাস্কর সিংহ মনে মনে রাজার এই রীতি সভা আহ্বানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করছিলেন। সরল প্রাণ, প্রজানুরাগি রাজা নৃসিংহদেবের জন্য চিন্তিত হচ্ছিলেন ভাস্কর সিংহ। মনে মনে প্রার্থনা করছিলেন তিনি, রাজা যেন দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে শক্তিধর সেনানায়কদের সন্দেহভাজন না হয়ে ওঠেন।

সভার মধ্যমণি রাজা নৃসিংদেবকে যেন চিন্তাগ্রস্ত দেখায়, কিন্তু তিনি স্থির অচঞ্চল। স্তব্ধতা ভঙ্গ করে সমবেত রাজপ্রতিনিদের সম্বোধন করে রাজা বললেন।—হোলিউৎসব, মৃগয়াভিযান এবং তৎপূর্বে প্রজাপুঞ্জ ও সেনাবাহিনী পরিদর্শন ইত্যাদি কর্মসূচী আলোচনার জন্য আপনাদের আহ্বান করেছি। আলোচনান্তে আপনাদের মূল্যবান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

—'প্রদ্যুম্নপুরাধিপতি মহারাজ নৃসিংহদেবের জয় হোক।'—সমবেত স্বর ধ্বনিত হয়ে সভাস্থলের মর্যাদা বৃদ্ধি করল। নানা প্রকার প্রশ্ন ও আলোচনা চলতে লাগলো। সিংহাসনে আসীন রাজা নৃসিংহদেবের দুই পার্শ্বে দুইজন চামরবাহিনী নটীর হাতের স্বর্ণদণ্ড চামরের নীরব আন্দোলনে সভাগৃহের ফেনশুভ্র দুকূল-বাসের প্রান্ত থর থর কাঁপছে। ধীরে নির্দিষ্ট আসনের সম্মুখে উঠে দাঁড়ালেন সেনাপতি কংসারী। বিনয়াবনত হয়ে মহারাজকে অভিবাদন করে বিনীতস্বরে বললেন।

—মহারাজ সুবিবেচক। আমার প্রতি তাঁর অসীম স্নেহ, সেই স্নেহের দাম দিতে সর্বক্ষণ আমাকে রাজা ও রাজ্যের কল্যাণ চিন্তায় কাটাতে হয়। সেনা-বাহিনীই হল রাজ্যের শক্তির প্রধান উৎস আর সেই সৈনাপত্য শুধু সাহস ও শক্তি থাকলেই করা যায়না তার সঙ্গে চাই বুদ্ধির সংমিশ্রণ। তাই আমার পক্ষ থেকে মহারাজকে নিশ্চিন্ত করে এই কথাই বলতে চাই যে আগত হোলি-উৎসব ও মৃগয়াভিযানের জন্য আয়োজন করুন। রাজ্যের তাবৎ হিতাহিতের ভার নিয়ে আমি অতন্দ্র প্রহরায় থাকব। মহারাজ নিশ্চিন্ত মনে প্রমোদ বিহার করুন। আমি বেঁচে থাকতে রাজ্যের কোন অমঙ্গল হবে না। পুনরায় অভিবাদন করে উপবেশন করলেন সেনাপতি কংসারী।

মহারাজ নৃসিংহদেব নীরবতা অবলম্বন করেন। হয়তো সেনাপতির উক্তিগুলি অনুধাবন করতে সচেষ্ট হন। পরমুহূর্তেই তিনি যেন কাকে সন্ধান করেন চোখের দৃষ্টিচালনায়। যাঁকে চাইছেন তাঁকে দেখে পরিতৃপ্তির হাসির সঙ্গে বললেন।

—একান্ত সচীব ভাস্কর সিংহ, তুমি এক সপ্তাহকাল আমার সমস্ত প্রজাপুঞ্জের সুখ দুঃখের সংবাদ গ্রহণ কর। সামন্ত নৃপতিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমুদায় বিবরণ রাজসভায় জ্ঞাপন করবে।

সসম্ভ্রমে নত হয়ে অভিবাদন করে ভাস্করসিংহ। নির্দেশ দান স্থগিত রেখে

কি যেন ভাবতে থাকেন রাজা নৃসিংহদেব চোখের দৃষ্টি ঘুরিয়ে আবার সরব হলেন তিনি।

—মহামন্ত্রী, আপনি হোলি উৎসব এবং মৃগয়াভিযানের সমস্ত আয়োজন করুন।

রাজপুরীতে দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজে। মহারাজ নৃসিংহদেব সভা ভঙ্গ করে গাত্রোত্থান করলেন। সভার পাত্র অমাত্য সভাসদ্‌গণ সকলেই রাজাকে অভিবাদন করে বিদায় নিল।

প্রাসাদের বিরাম মন্দিরে গিয়ে রাজা কেতকী-সুরভিত জলে স্নান করলেন। পালঙ্কে উপবেশন করলে কিঙ্করীরা কক্ষে অগুরুবাতি জ্বালিয়ে দিল। কিঙ্করী প্রমদা প্রতিদিনের মত স্বর্ণ রেকাবিতে সুমিষ্ট ফল সাজিয়ে এনে পালঙ্কের পাশে দারুপীঠিকার উপর স্থাপন করে। রেকাবি থেকে কয়েক টুকরো ফল তুলে মুখে দেন রাজা।

কয়েকটি দ্রাক্ষা।

আহার করতে করতে প্রমদার দিকে চোখ তুললেন।

—কন্যা চন্দ্রকুমারীর খাওয়া হয়েছে ?

—না পিতা। অন্য সকলের মত মহারাজের আহারান্তে আহার করেন সখী চন্দ্রকুমারী।—নত নম্র কণ্ঠে উত্তর দেয় কিঙ্করী প্রমদা।

পূর্ণশশীর প্রভার মত পূর্ণ এক তৃপ্তির জ্যোৎস্না রাজার প্রীত নয়নের নীলিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

এমন সময় মহারাজার আদেশক্রমে বিশ্রামাগারের দ্বারে মৃদুপায়ে একান্ত সচীব ভাস্কর সিংহ এসে দাঁড়াল।

মহারাজের ইঙ্গিত পেয়ে দ্বার ছেড়ে দাঁড়াল দ্বারপাল। মহারাজকে অভিবাদন ক'রে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ভাস্কর সিংহ। মহারাজ সকলকে চলে যেতে বলে ভাস্কর সিংহকে পালঙ্কের পাশে মহারাজের সম্মুখে একটি দারুবেদিকায় বসতে বললেন। ভাস্কর সিংহ নম্র ভঙ্গিমায় মহারাজের সম্মুখে উপবেশন করলেন।

গৃহের সৌগন্ধ বাতাসে ছুটোছুটি করছিল।

—আজকের সভা পর্যালোচনা করে কিছু বুঝতে পারলে ভাস্কর।—আলোচনায় উৎসুক মহারাজ।

—মহারাজ সেনাপতি কংসারীর অতি বিনয় এবং কথার মধ্য দিয়ে সৈন্য শক্তির উল্লেখ আপনার লক্ষে এসেছে কিনা···।

ভাস্করের বক্তব্য শেষ হ'ল না। মস্তক আন্দোলিত ক'রে সমর্থকের ভঙ্গীতে রাজা বললেন।

—সুন্দর। ঠিক এই কথাটাই আমি চিন্তা করেছি ; তাছাড়া কয়েক জন

অমাত্য কোন বক্তব্য রাখলো না। সেনাপতির চোখে চোখ রেখে তারা নিশ্চুপ ব'সে ছিল। আমার মনে হয় পূর্বাহ্নেই কংসারী এদের দীক্ষিত করেছে।

—হ্যাঁ মহারাজ এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত কেন না ইতিপূর্বেই চরমুখে আপনি অবগত হয়েছেন সেনাপতির ভবনে এরা মিলিত হয়েছিল।

—শোন ভাস্কর। বিগত সন্ধ্যায় সেনাপতি ভবন থেকে চুপিসারে এক অচেনা আগন্তুককে বহির্গমন করতে দেখা গেছে। আমি জানতে চাই কে সেই আগন্তুক? কোথা থেকে? কার কাছ থেকে সেনাপতি ভবনে এসেছিল? কি তার উদ্দেশ্য?

মহারাজ নৃসিংহদেব পালঙ্ক থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর স্নানসিক্ত দেহ সুন্দর, পাবকের মত শুচিশুভ্র দেখাচ্ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান ভাস্কর সিংহ।

—হ্যাঁ আর একটা কথা। কন্যা প্রমদার কাছে তুমি কি কিছু জেনেছ? অনুসন্ধিৎসু রাজার কণ্ঠস্বর।

হঠাৎ উদ্দীপ্ত আলোকের মত অদ্ভুত এক রক্তিম আভায় ভরে ওঠে ভাস্করের মুখ। যেন বহুদূরে এক বাড়বানলের দ্যুতি জ্বলছে আর ভাস্করের মুখে তার প্রতিচ্ছায়া পড়েছে। তাঁর নয়নের প্রচ্ছায়ে স্নিগ্ধবেণী কজ্জলিত আঁখি রঞ্জিত অধর, কেয়ূর-কিঙ্কিণী-কাঞ্চীভূষিতা প্রমদার মূর্তি মূর্ত হ'য়ে সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দাঁড়ায়।

—ভাস্কর!—স্নিগ্ধ স্বরে আহ্বান করেন রাজা।

চমকে ওঠেন ভাস্কর সিংহ। মোহকুহেলিকার আড়াল থেকে হঠাৎ যেন বেরিয়ে আসে তাঁর মন।

—ক্ষমা করুন মহারাজ। আমি হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম, না মহারাজ। কিঙ্করী প্রমদার কাছ থেকে আমি কিছু শুনি নি।

মৃদুহাস্যে পৌর্ণমাসী সন্ধ্যার চন্দ্রের মত চোখ তুলে তাকান মহারাজা, বলেন—

—প্রমদা প্রদ্যুম্নপুরের রাজগৃহে কন্যাসমা ভাস্কর। সে রাজকুমারী চন্দ্রকুমারীর সহচরী। কিঙ্করী বলে তাকে ছোট করে দেখো না। আমি জানতে চাই কতদিন তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি?

—পক্ষকাল।—যৌবনান্বিত দুই স্বপ্নালু চোখ নত করেন ভাস্কর সিংহ।

—সে কি!

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে রাজা নৃসিংহদেবের বক্ষের নিশ্বাস তার হাতে অদৃশ্য বেণু-যষ্ঠি যেন থর থর ক'রে কেঁপে উঠে বিদ্রূপের অট্টহাস্যে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে ভাস্করের পিঠের উপর। বাষ্পার্দ্র হয়ে ওঠে ভাস্কর সিংহের দুই চক্ষু। এই ঐশ্বর্যবান পিতৃহৃদয়ের খোঁজ জানে না রাজলোভি কুতন্ত্রের দল। কে বলে

রাজা নৃসিংহদেব দুর্বল ? কে বলে রাজা নৃসিংহদেব অচতুর ? কে বলে রাজা নৃসিংহদেব হৃদয়হীন ?

উন্মুক্ত বিস্ফারিত হৃদয় ভাস্কর সিংহ প্রণয়বিবস নয়ন তুলে রাজার প্রশ্নাকুল নয়নের দিকে বারেকের জন্য তাকায়। মুগ্ধ স্বরে বলে।

—আপনি শুধু প্রদ্যুম্নপুরের মহারাজ নন্। আমাদের সকল প্রাণের পিতা— ।—নত হয়ে রাজার পদস্পর্শ ক'রে প্রণাম করেন ভাস্কর সিংহ।

রাজোদ্যানে কানাই সায়রের তটে এসে দাঁড়ায় ভাস্কর সিংহ। সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হয়ে আছে দিব্যগন্ধ চম্পক, মৃদু সমীরণে বিহ্বল বনবায়ু। পুষ্প চয়ন করছে প্রমদা। মাল্য রচনা সমাপ্ত হ'য়েছে। নিকটে এসে দাঁড়ায় প্রমদার প্রেমিক ভাস্কর। সেই মুহূর্তে সকল অভিমান ছিন্ন করে প্রমদার অন্তরে এক নবোষার অরুণিত বিহ্বলতা সঞ্চালিত হয়। বিদ্যুল্লেখার মত স্ফুরিত লাস্যে চঞ্চলিত হয়ে ওঠে প্রমদার দেহবল্লরি। ভাস্কর সিংহের সতৃষ্ণ দুই বাহুর আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করে প্রমদা। প্রণয় সঙ্গীতের শুচিতা অনুরাগের পরাগের মত প্রমদার অশ্রুপ্রবাহে সিক্ত হয়।

—কোথায় ! কোথায় ছিলে এতদিন ?

ভাস্করের তৃষার্ত বাম বাহুর মধ্যে প্রমদার বরতনু থর থর কাঁপে। তাঁর সিতচন্দনে সিক্ত সহকার কিশলয়ের মত দুটি ওষ্ঠ, প্রমদার কম্পিত অধরের বাণী গুঞ্জরণ স্তব্ধ করে দেয়।

রাজোদ্যানের নিকুঞ্জে পত্রচ্ছদ এক তরুতলে বসে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে প্রমদা কিন্তু সেই অপরিচিত আগন্তুকের অবয়বের চিত্র আর সেনাপতি-ভবন থেকে রাজধানীর বিপণীশ্রেণীর দিকে চলে যাওয়ার তথ্যটুকু ছাড়া আর কিছুই নিবেদন করতে পারে না প্রমদা।

রাজনিকেতনে আলো জ্বালে বাতিদার, সেইদিকে তাকিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে প্রমদা। রাজরোষের কল্পনায় তার নম্র নয়ন নিষ্প্রভ হয়।

—আমি যাই। দূর্বাসন হতে উঠে দাঁড়ায় প্রমদা।

—কেন ? কিসের ভয় প্রমদা ? জানতে চায় ভাস্কর সিংহ।

—এই গোপন অভিসার রাজরোষের কারণ হ'তে পারে ভাস্কর। দগ্ধপক্ষ বিহঙ্গীর মত বেদনার্ত তার কণ্ঠস্বর।

*

হেসে ওঠেন ভাস্কর—সন্দেহ দূরে রাখ প্রমদা। তুমি জাননা রাজা নৃসিংহদেবের হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে আছে এক পিতার প্রাণ। পক্ষকাল রাজকাজে ব্যস্ত থেকে তোমার কাছে আসিনি বলে আজ আমাকে তিরস্কার করেছিলেন তিনি।

—মহারাজ ! বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয় প্রমদা ।

—হ্যাঁ স্বয়ং মহারাজ নৃসিংহদেব । শুধু তাই নয় শুনে আশ্চর্য হবে যে তিনি আমাদের সকল সংবাদ পূর্ব হতেই অবগত আছেন । তোমার আমার বক্ষোজবাসনা অন্ততঃ রাজরোষে ধূলিলুণ্ঠিত হবে না কখন ।

—কি বলছ ভাস্কর ! অভাবিত বিস্ময়ে নম্র হয়ে যায় প্রমদার দৃষ্টি ।

—হ্যাঁ প্রমদা । তাঁর সস্নেহ শাসন আমাকে আজ নতুন করে চিনিয়ে দিয়েছে তাঁকে ।

—তিনি পিতা, তিনি আশীর্বাদক ।—প্রমদার দৃষ্টিতে এক অমেয় শ্রদ্ধার সুষমা অভিনব এক মদিরতায় আরও নিবিড় হয়ে ওঠে ।

—ঠিক বলেছ প্রমদা, অপরের জীবনে সুখ ও কল্যাণ আহ্বান করে যে বাণী, সেই বাণীই তো আশীর্বাণী ।

রাজোদ্যানে পুষ্পতরুতলে দাঁড়িয়ে প্রমদার নয়ন এক অপার্থিব জ্যোৎস্নার হর্ষে পুলকিত হয় । সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে, সশ্রদ্ধ মুগ্ধতায় একটি মাত্র বাক্য উচ্চারণ করতে পারে প্রমদা ।

—ভাস্কর, আমি আনন্দিত ।

যোতবিহারের সন্নিকটস্থ প্রান্তর ।

মাথার উপর কালচক্রে ধাবিতা অতন্দ্রিতা চন্দ্রিমা । নীচে দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর নিঝুম । এক অশ্বারোহী সেই প্রান্তরের বুক চিরে ধাবিত হচ্ছিল । সর্বাঙ্গ ঘামে ভেজা । কান্তিতে তার চোখের নীচে গভীর কালো রং । নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ক্ষত দিয়ে গল গল ক'রে রক্ত বের হয়ে আসছে । হাত দিয়ে সে চেপে ধরে আছে তার ক্ষতস্থান । দাঁতে দাঁত চেপে সে যেন আটকে রেখেছে তার প্রাণবায়ু । অশ্বের পা পড়ছে তালে তালে । তীব্র বেগে ছুটছে অশ্ব । অশ্বারোহী যোতবিহার থেকে ছুটে যাচ্ছে প্রদ্যুম্নপুরে রাজসন্নিধানে । দৃষ্টি বেশীদূর চলছে না অশ্বারোহীর, ঝাপসা হয়ে আসছে । পেটের ভেতর থেকে বমনেচ্ছা মুচড়ে উঠছে কণ্ঠনালীর মধ্যে । প্রান্তর অতিক্রম করে গ্রাম্য সরু পথরেখার উপর এসে পড়ল ধাবমান অশ্ব । ক্রমে গ্রামাভ্যন্তরে অশ্বক্ষুরধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো ।

লাউগ্রাম ।

পশ্চিম প্রান্তে বনভূমির মধ্যে তীরন্দাজী অনুচরদের নিয়ে অনুশীলন সমাপ্ত করে গ্রামপথেই ফিরে আসছিলেন রঘুনাথ ।

হঠাৎ মনুষ্য সমাগমে চঞ্চল হয়ে উঠলো ধাবমান অশ্ব । পরমুহূর্তেই মুখের রজ্জুর টানে মস্তক দক্ষিণাভিমুখি করে প্রচণ্ড হ্রেষাধ্বনি সহকারে সম্মুখের দুইপদ ঊর্ধ্বায়িত ক'রে নিশ্চল হয়ে গেল ধাবমান অশ্ব ।

লক্ষ্য করলেন রঘুনাথ অশ্বপৃষ্ঠে আহত জনৈক ব্যক্তি নির্বাক স্তব্ধতায় তারই দিকে চেয়ে আছে। দ্রুত সাহায্য দিয়ে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে আগন্তুককে নামিয়ে নিলেন তিনি। তাঁর মল্লসদৃশ দুই বাহু অনায়াসে আহত ব্যক্তিকে বহন করে পথিপার্শ্বেই দুর্বামঞ্জরীর উপর শুইয়ে দিল। বিচলিত নিঃশ্বাসের আলোড়ন দমন করতে চেষ্টা করল আগন্তুক। অবশেষে ধমনীর প্রতি শোণিতকণা জোর করে মুখের উপর টেনে আনতে চাইল আগন্তুক। কি যেন বলতে চায়। তার মুখমণ্ডলের উপর ঝুঁকে পড়েন রঘুনাথ।

—বিশ্বাস কর, শীঘ্র বল কি বলতে চাও।—স্থির দৃষ্টি রঘুনাথ মনে মনে চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দ থেকে যেন উৎকর্ণ হয়ে দূরান্তের স্বর অনুধাবন করতে চেষ্টা করে মৃত্যুপথযাত্রী।

—শুনতে পাচ্ছ? রঘুনাথ আহতের বক্ষে হাত রাখেন।

—কে তুমি? আবার প্রশ্ন করেন রঘুনাথ।

—গুপ্ত-চর। মৃদুস্বরে উচ্চারণ করে আগন্তুক।

—কার? রাজা নৃসিংহদেবের? প্রশ্ন করেন রঘুনাথ।

ওপর নীচে মৃদু মস্তক সঞ্চালন ক'রে সম্মতি জানায় আগন্তুক ধীরে ধীরে সে শব্দ উচ্চারণ করতে চেষ্টা করে। কম্পিত হাতে পোষাকের ভিতর থেকে তাম্রপত্র নির্মিত রাজনামাঙ্কিত একটি পরিচয় ফলক বের করে দেয় আগন্তুক।

তার চোখের দ্যুতি ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হয়ে আসে।

—'যোতবিহার রাজার চর!'—আবার সামলে নিতে চেষ্টা করে সে।

পুনরায় তার স্বর শোনা যায়।

—সেনাপতি কংসারীর বাসভবন থেকে পিছু নিয়েছিলাম।

শ্বাসকষ্ট রোধ করতে চেষ্টা করে আগন্তুক, খানিক থেমে আবার বলতে চেষ্টা করে।

—রাজা নৃসিংহদেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে প্রতাপনারায়ণ।

সেনাপতি কংসারী পিছনে থাকবে।—

এক নিঃশ্বাসে দ্রুত বলে মৃত্যুপথযাত্রী।

রঘুনাথের একজন অনুচর একটি পাত্রে জল নিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে কিন্তু রঘুনাথ জলপান করতে দেন না মৃত্যুপথযাত্রীকে। উৎকর্ণ হয়ে আহত ব্যক্তিটির কথা শুনতে চান তিনি।

—বল আর কি বলবার আছে? রঘুনাথের মুখমণ্ডল রক্তরঞ্জিত হয়ে ওঠে।

মৃত্যুপথযাত্রীর মুখমণ্ডল সাদা হয়ে আসছে। কোন মতে নিজেকে সামলাতে চাইল আগন্তুক। আবার তার ক্ষীণস্বর শোনা গেল—

—চুক্তি !—যন্ত্রণাক্ত হয়ে ওঠে আহতের মুখ। খানিক থেমে আবার বলে।

—কংসারীর সঙ্গে চুক্তিপত্রে সই করিয়ে নিয়ে গেছে যোতবিহারী দূত গণপতি সিংহ।—যন্ত্রণাক্ত চোখ স্ফটিক শিলার মত নিস্পন্দ হয়ে স্থির হয়ে রইল। কেবল সেই বিষণ্ণ সন্ধ্যার আলোকে ক্ষণিকের মত তার ওষ্ঠ প্রকম্পিত হতে থাকে। এবার জল দেন রঘুনাথ। সুদুঃসহ আগ্রহে চঞ্চল জিহ্বা জল গলধঃকরণ করবার আগেই কণ্ঠনালী রুদ্ধ হল। বক্ষের দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করেন রঘুনাথ। শুষ্ক কঠোর অথচ ব্যথিত দৃষ্টি তুলে সাথীদের হতভাগ্যের দেহ গোপনে বনমধ্যে সমাধিস্থ করতে বললেন। তাঁর একজন সহচর মৃতের অশ্বটির মুখরজ্জু ধরে তখনও টহল দিচ্ছিল। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছিল অশ্বের হৃৎপিণ্ডের গতি। অবধারিত মৃত্যু থেকে রক্ষা করার জন্যই এই ব্যবস্থা নিয়েছে রঘুনাথের সহচর।

রঘুনাথের আর একজন সহচর দুর্ধর্ষ যোদ্ধা অঙ্গদ রায়কে নিভৃতে আহ্বান করে কর্তব্য স্থির করলেন রঘুনাথ। মৃতদেহ সমাধিস্থ করার দায়িত্ব যাদের উপর দেওয়া হয়েছে তাদের ব্যতিরেকে আর সবাইকে গৃহে ফিরে যেতে বললেন রঘুনাথ।

মৃতদেহ নিয়ে চলে গেল অন্যেরা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটি তেজস্বী অশ্ব নিয়ে রঘুনাথের কাছে এসে দাঁড়াল অঙ্গদ।

সময় নষ্ট করলেন না রঘুনাথ। পরিকল্পনা আর একবার বুঝিয়ে দিয়ে অশ্বের মুখে রজ্জু সংযোজিত করে প্রস্তুত হলেন দুইজন। পরমুহূর্তেই অশ্বারূঢ় হয়ে দুইজন দুইদিকে ধাবিত হলেন। রঘুনাথের অশ্ব বনভূমির মধ্য দিয়ে রাজধানীর দিকে ছুটে চলে।

অঙ্গদ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে অশ্ব ছুটিয়ে দিল। প্রদ্যুম্নপুরাধিপতি রাজা নৃসিংহদেবের অধীনস্থ যোতবিহার এখান থেকে চারযোজন পথ।

যোতবিহার নামটা বার বার মনে মনে আওড়াতে থাকে অঙ্গদ। আরও এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করতে হবে। অতীব সামান্য। সারাদিনের রৌদ্রালোকের দহন জ্বালার পর স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছে ফাল্গুন সন্ধ্যার সমীর।

জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত যোতবিহারের রূপ। সুদৃশ্য অট্টালিকা এখানে-ওখানে। রাজবাড়ির দিকে গেল না অঙ্গদ। ধীরে নগরীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে একটি বিপণীর সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। তৈলদীপে আলোকিত পান্থশালার মত ক্ষুদ্র একটি পুষ্প বিপণী এটি। ভিতরের দারুবেদিকা থেকে একখানি সদ্য গ্রথিত মাল্য হাতে করে এক বিধুমুখী নারী সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

—শুধুই কি মালা চাই। বিলোল বল্লভসন্ধানী কটাক্ষের জিজ্ঞাসা।

—আর কি পেতে পারি? সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করে অঙ্গদ।

—আপনার প্রেমাভিলাষিণীরা গৃহাভ্যন্তরে অপেক্ষারতা। আর একটি মাল নিশ্চয়ই চাই? অন্য একটি সুরভিত মাল্য অঙ্গদের সম্মুখে তুলে ধরে মালিন চমকিত হয় অঙ্গদ। বাহুবলয় বন্ধনে অনুগৃহীতা হতে চায় বারাঙ্গনার অন্তহীন ছলনা।

—আপনি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে ভিতরে আসুন। দেখে নিন কাকে চাই।—প্রণয়িজনোচিত মোহ মালিনীর কণ্ঠে ঝড়ে পড়ে। একটি মোহর মালিনীর দিকে এগিয়ে ধরে অঙ্গদ। প্রসারিত হাতে মোহরটি নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে মালিনী কোথায় বসতে দেবে, কিভাবে আপায়ন করবে বুঝতে পারে না সে। এতক্ষণে দ্বার রক্ষক একটি তৈল চিকণ লাঠি হাতে এগিয়ে এসে আড়চোখে একবার অঙ্গদের আপাদমস্তক জরিপ করে নিল। সময় নষ্ট করল না অঙ্গদ, আর একটি মোহর ছুঁড়ে দিল দ্বার রক্ষকের দিকে। রাজপুরুষজনোচিত গাম্ভীর্যে আদেশের ভঙ্গীতে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়।

—গণপতি সিংহকে চেন?

—হ্যাঁ হুজুর নিশ্চয়ই চিনি। তিনি রাজার প্রিয়পাত্র একজন প্রধান কর্মচারী। গর্বস্ফীত কণ্ঠে উত্তর দিল দ্বারী।

—কেমন করে চিনলে? বিশ্বাসভাজনের মত নিবিড় শোনা যায় অঙ্গদের কণ্ঠস্বর।

—তিনি আমাদের এখানে এসে থাকেন হুজুর।

মালিনীর দৃষ্টি ব্রীড়াবনতা কিম্বা গর্বিতা ঠিক অনুমান করতে পারে না অঙ্গদ।

সেই মুহূর্তে হৃষ্টচিত্ত অঙ্গদ আরো দুইটি মোহর ছুঁড়ে দেয়।

—সুন্দরী শ্রেষ্ঠা চাই। দুখানি ঘর ঠিক রাখ, বন্ধু গণপতিকে নিয়ে আজকের রাত এখানেই উপভোগ করতে চাই। আরো পাবে। বিগলিতচিত্তা মালিনী আভূমি নত হয়ে অভিবাদন করে।

—আপনারা আসুন হুজুর শ্রেষ্ঠ উপাচার প্রস্তুত থাকবে। উৎফুল্ল মালিনী সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

হ্যাঁ। অনেকদিন পরে এসেছি তাছাড়া রাত্রিতে ঠিক অনুভূত হয় না। বন্ধু গণপতির গৃহ কোনদিকে?—নিতান্তই সাধারণভাবে প্রশ্ন করে অঙ্গদ।

—ঐ যে হুজুর। দ্বার রক্ষক গদগদ চিত্তে এগিয়ে আসে। ঐ যে হুজুর, ঐ দ্বিতল বাড়ি।

অঙ্গদ চেয়ে দেখল একটি প্রশস্ত চাতালের ওপারে তিন-চারিটি গৃহের পর একটি দ্বিতল গৃহ।

—ঠিক আছে। আর অপেক্ষা না করে অশ্বের মুখ ঘুরিয়ে দিল অঙ্গদ। আশাতীতভাবে অভ্যর্থনা করল দ্বার রক্ষক।

—হুজুর গৃহে আছেন ? অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়াল অঙ্গাদ।

—হ্যাঁ হুজুর। ডেকে দিচ্ছি। দ্রুত গৃহাভ্যন্তরে চলে যায় দ্বার রক্ষক।

পথের উপর দাঁড়িয়ে থাকে অঙ্গাদ। তীব্র উত্তেজনার আতিশয্য দমন করতে প্রিয় অশ্বটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে সে। তীব্র বিস্ময় নিবিড় অপলক দৃষ্টির সম্মুখে গৃহ হতে বেরিয়ে আসে গণপতি সিংহ। নাতিদীর্ঘ। সাধারণ। মনে মনে জরিপ করে অঙ্গাদ। দৃষ্টির সংযম ফিরিয়ে আনে সে।

—শুভমস্তু। আমি বোধহয় মাননীয় গণপতি সিংহের সঙ্গে কথা বলছি। অবিচল দুটি চক্ষুর শান্ত দৃষ্টি অঙ্গাদের।

—হ্যাঁ। কিন্তু কে আপনি ?

—প্রদ্যুম্নপুরের মাননীয় সেনাপতি কংসারীর কাছ থেকে আসছি। ঝুঁকে পড়ে নতস্বরে সুতীক্ষ্ণ সায়কের মত কথাটা ছুড়ে দেয় অঙ্গাদ।—কিন্তু এখানে নয়। চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অঙ্গাদ। একটু থেমে আবার বলে। নিভৃতে আলোচনার জন্য এইমাত্র ঐ পুষ্পবিপণীতে দুখানি কক্ষ সংরক্ষিত করে এসেছি বন্ধু। যদি অসুবিধা না হয়—শ্রদ্ধানম্র শোনায় অঙ্গাদের কণ্ঠস্বর। একটি মুহূর্ত। অন্তরের সব তৃষ্ণা উদগ্র হয়ে গণপতির ইন্দ্রিয়ে সঞ্চালিত হয় তিলে তিলে। চোখের দৃষ্টির মধ্যে ব্যাকুলতা।

—বন্ধু। অপরাধ মার্জনা করুন। আজকের সমস্ত খরচ আমার কাছে দিয়েছেন মাননীয় সেনাপতি কংসারী।—সঙ্কোচে যেন দ্বিধান্বিত শোনায় অঙ্গাদের কণ্ঠস্বর।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে এত সঙ্কোচের কি আছে ? তিনি আমাকে জানেন বলেই না। থেমে যায় গণপতির লোভী কণ্ঠস্বর। পায়ে পায়ে পুষ্পবিপণীতে এসে দাঁড়ায় তারা। মালিনী অভ্যর্থনা করে ক্ষুদ্র বিপণীর পশ্চাত দ্বার দিয়ে ভিতরে নিয়ে যায় অভ্যাগত দুইজনকে। তৈলদীপ আলোকিত অলিন্দ পার হয়ে সারি সারি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করে দুইটি বিশেষ প্রকোষ্ঠের সম্মুখে এসে দাঁড়ায় মালিনী।

—ভিতরে চলে যান হুজুর সেরা রঙ্গিনী প্রস্তুত আছে। সশ্রদ্ধ কণ্ঠে কথা ক'টি বলে চলে যায় মালিনী।

কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে গণপতি ও অঙ্গাদ। দীপাধারে মৃদু আলোক, অগুরু বর্তিকার গাঢ় সুবাস, নেশা জাগায়। সম্মুখে এসে দাঁড়ায় দুই লাস্যময়ী। পরণে দামী মখমলের ঘাগরা। হর্তেলেব বর্ণ বুকের আভা ফুটে বের হচ্ছে কাঁকুলির বাঁধন ভেদ করে। ওরা কাছে এসে দাঁড়ায়। বিলোল কটাক্ষে স্পর্শ করে বাতের বিশেষ অতিথির অঙ্গ। যেন কামনা ব্যাকুল উত্তপ্ত উদগ্র সে স্পর্শ। সারা দেহ থর

খর করে কাঁপছে যেন। গণপতি একজনকে কাছে নেয়, অঞ্চলের আবরণ খসে পড়ে। অন্যজন অঙ্গদের হাত ধরে আকর্ষণ করে তাকে পাশের কক্ষে নিয়ে যায়। বাতাসে ভেসে আসে রাতের আঁধার জাগা পুষ্পের তীব্র মদির সুবাস। ভাবতে থাকে অঙ্গদ। প্রার্থনা করে মনে মনে কাঁপন উঠুক পরদারিক গণপতির নেশালাগা রক্তে। ঝাঁপি খোলা বিষধর ফণা তোলা, সামনে বশীকরণের কাজল পরে দাঁড়ানো নাগিনী কন্যার মত ঐ নিশীকন্যার উদগ্র যৌবন শিখার দীপ্তিতে গণপতির আদিম সত্তা নির্লজ্জ নগ্নতায় অসাড় হোক। শিথিল হোক সকল সংযম।

হঠাৎ চমক ভাঙে অঙ্গদের। তার অনামনস্ক মন এতক্ষণ অনুভব করেনি তার শায়িত বক্ষের উপর দক্ষিণ হাত বেষ্টন করে তার চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে দুটি সুপক্কমল নয়নের তারা। মাদকতাময় সুবাসিত কোমল বর্তুল-স্পর্শ এতক্ষণে নিজের দক্ষিণ বক্ষে অনুভব করে অঙ্গদ। আর একবার চোখ তুলে আবারও চমকে ওঠে অঙ্গদ। এ চাহনি চেনে সে মনে হয় এই নিশিকন্যা অন্তর্ভেদী দৃষ্টিপাতে বুঝতে চাইছে স্খলিত পৌরুষ এই রাতের অতিথির কি কোন গোপন উদ্দেশ্য আছে?

—মনকে সংযত করে অঙ্গদ। তার বাম তর্জনী যেন আলিম্পন রচনার জন্য উৎসুক হয়ে সেই নিশিকন্যার পুলকিত কপোল ও চিবুক স্পর্শ করে। দক্ষিণ হাত স্পর্শ করে সুগঠিত কোমল পৃষ্ঠের উপর সুবাসিত বক্ষবাসের ছান্দিক গ্রন্থিতে।

এতক্ষণে চেনা জগতে ফিরে আসে রাত্রির মক্ষিকা, স্ফুরিত লাস্যে রঙ্গিনী অধর মৃদু বঙ্কিম হয়। রাতের তারা-জ্বলা আকাশে কোথায় ডাকছে রাতজাগা পাখি।

রাত থমথম। মাধুকী আসর বিহ্বল অভিসার অভিযান শেষ করে বিভ্রমনিপুণা নগরবধূ সুন্দর ছলনায়। ঝিকিমিকি তারাজ্বলা আঁধারে, মুক্ত আকাশের নীচে এসে দাঁড়ায় গণপতি সিংহের সঙ্গে অঙ্গদ রায়। গণপতির চোখে মিষ্টি প্রশান্তিমাখা। ধূপের মত মিষ্টি গন্ধে ক্ষীণ মদালস এক প্রেমের সৌরভ তার মনোজগৎ ভরিয়ে রেখেছে। অশ্বের মুখরজ্জু বাম হাতে ধরে মৃদু পায়ে গণপতির সঙ্গে হেঁটে চলে অঙ্গদ।

—যে খবর দিতে এসেছিলাম বন্ধু। মৃদুস্বরে বলে অঙ্গদ।

—হ্যাঁ বল। উৎসুক হয় গণপতি।

—তুমি সেনাপতি ভবন থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে রাজার একজন গুপ্তচর তোমার পিছু নিয়েছে। জানার সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতি তোমায় খবরটা—

—অঙ্গদের কথা শেষ হয় না। হো হো করে হেসে ওঠে গণপতি সিংহ।

—চিন্তা নেই বন্ধু তাকে আমরা ধরে ফেলেছি। তাকে আর এ রাজ্যের মধ্যে নৃসিংহদেবের চর সন্দেহে আরো পাঁচজনকে আজ সায়াহ্নে মশানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

—কেউ কি বেঁচে আছে? অঙ্গদের স্বর স্থির।

আবার হেসে ওঠে গণপতি সিংহ।—না বন্ধু দীর্ঘভল্ল তাদের বুকের উষ্ণতা স্তব্ধ করে দিয়েছে। কাল ভোর হতে না হতে নিশ্চয়ই এক ঝাঁক শকুন নামবে মশানের ময়দানে। তাদের দীর্ঘ কঠিন শাণিত ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে ওদের বুক খণ্ড খণ্ড করে তাদের আকাশ জোড়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকটি নরকংকাল ছাড়া আর কিছুই পড়ে থাকবে না। ক্রুর হাসি হাসে গণপতি। রাতের বাতাস হু হু শব্দে মাতন আনে। বৃক্ষ চূড়ায় বিব্রত চঞ্চল হয়ে ওঠে ঘুমভাঙ্গা পাখি।

—তাহলে সব প্রস্তুত? অঙ্গদের চোখে গভীর অতলস্পর্শী চাহনি।

—সব প্রস্তুত। রাজার মৃগয়াভিযানের সংবাদ প্রাপ্তির পরদিন পূর্ব-সিদ্ধান্তমত রাজা প্রতাপনারায়ণ প্রদ্যুম্নপুর রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করবে।

গণপতি সিংহের দুই চক্ষু স্বপ্নবিভোর। এখনও যেন কামাতুর হয়ে আছে তার দৃষ্টি।

প্রাণপণে নিজেকে সামলে নেয় অঙ্গদ দৃঢ়তার কঠিন আবরণের অন্তরালে।

হাঁটতে হাঁটতে গণপতি সিংহের বাড়ির সম্মুখে এসে পড়ে তারা।

—তবে নিশ্চিন্ত মনে বিদায় নিতে পারি? পরম বিশ্বাসভাজনের মত শোনায় অঙ্গদের কন্ঠস্বর।

হ্যাঁ বন্ধু। যথাসময়ে খবর পাঠাতে বলবেন মাননীয় সেনাপতি কংসারীকে। আমরা প্রস্তুত থাকব।

রাত অনেক। দূরে প্রান্তর অন্ধকার নিবিড়।

সফলতার আতিশয্যে পৌরুষের অহংকার আমোদিত মনে অশ্বারূঢ় হয় অঙ্গদ। পরমুহূর্তেই অশ্বের গতি তীব্রতর হয়ে ওঠে।

* * *

ফুল্লকুসুমের মত অকস্মাৎ চন্দ্রকুমারীর দুইচক্ষু যেন এক বিশ্বাসের স্পর্শে উৎসুক হয়ে ওঠে।

—তুই ঠিক দেখেছিস প্রমদা?

—হ্যাঁ সখী, কিন্তু…

—কিন্তু?

—আমার ভয় হয়।

—কেন?

—ঐ আগন্তুকের পরিচয় তুমি জান কি ?

—না।

—তবে।

—জানি না প্রমদা, শুধু জানি আমার বক্ষের নিঃশ্বাস ঐ প্রিয় কণ্ঠচ্ছুরিত স্মিতহাস্যের জন্য তৃষ্ণায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। নবকিশলয়ের বৃন্ত চন্দনে অনুলিপ্ত করে রাজনন্দিনী চন্দ্রকুমারীর বক্ষঃপুটে পত্রলিখা এঁকে দিচ্ছিল সহচরী প্রমদা।

স্তবকিত মেঘভারের মত কেশদাম যৌবন মদায়িত দুইহাতে পশ্চাতে ঠেলে দিয়ে ভ্রূধনু ভঙ্গুরিত করে প্রমদার দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে অনুরোধ করে চন্দ্রকুমারী।

—সখী প্রমদা।

—কি ?

—দেখেছিস যদি ; একটিবার দেখিয়ে দে সেই বলদৃপ্ত সুন্দরতনু, একটি বার।

সখী চন্দ্রকুমারীর মুখের দিকে তাকায় প্রমদা। চমকে ওঠে প্রমদার হৃৎপিণ্ড। দুঃসহ ব্যথায় বিষন্ন হয়ে আছে চন্দ্রকুমারীর চক্ষু।

—এ কোন সর্বনাশ করেছে রাজপুত্রী ?

—আমি সেই দর্শনীয়কে একটিবার দেখতে চাই, 'সেই নয়নকান্ত নবারুণোপম সুন্দরপ্রভের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী আমার হৃদয়।' অনুরাগের পরাগপুঞ্জে পরিমলবিধুর চন্দ্রকুমারীর চিত্তোপবনের নিভৃতলীন কামনার কুসুমবোরকনিকর অশান্ত হয়ে ওঠে। অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে প্রমদা, সখী চন্দ্রকুমারীর যৌবনের কামনা অশ্রুসিক্ত আবেদনে কি সুন্দর করুণমধুর হয়ে ফুটে উঠেছে। নিজের অজ্ঞাতসারে চন্দ্রকুমারীর কম্পিত অধরে একটি চুম্বন এঁকে দেয় প্রমদা। ক্ষীণকটি, পীনবক্ষা, গুরুশ্রোণিভার দুই নারীর আলিঙ্গনে গৃহমধ্যে তৈলদীপালোকে অভিভূত ছায়া এই বাসনাবাসিত উৎসবের মুহূর্তগুলি নীরবে সহ্য করতে থাকে।

অকস্মাৎ নিজের মনের দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে প্রমদা। হৃদয়ের গভীরে এক জল ছল ছল সরসীর বুকে ফুটে রয়েছে প্রিয় ভাস্করের মুখবমণ্ডশোভা। চঞ্চল নিঃশ্বাস সংবরণের জন্য শান্ত হয়ে দাঁড়ায় প্রমদা। পরক্ষণেই সখী চন্দ্রকুমারীর হাত ধরে প্রসাধন কক্ষ থেকে বেড়িয়ে পড়ে।

কৌতূহলী বিহগীর মত দুর্বার আগ্রহে ছুটে গিয়ে ভবনপুরোভাগের নিকটে দূর্বাস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের প্রান্তে অন্ধকারে দাঁড়ায় দুটি তৃষিতা হৃদয়। চন্দ্রিমালোকে চুম্বিত হয়ে রয়েছে সমস্ত প্রাসাদ, তাছাড়াও অলিন্দে অলিন্দে, প্রাচীর গাত্রে, স্তম্ভ গাত্রে, দীপশিখা আপন হৃদয় পুড়িয়ে আলোকিত করে রেখেছে নিজ নিজ পরিধি।

—ঐ যে।—চকিতস্ফুরিত বিদ্যুতের ছায়া নাঁতত প্রমদার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখতে পায় রাজনন্দিনী চন্দ্রকুমারী, মন্ত্রণাকক্ষ অতিক্রম করে অলিন্দ পার হয়ে এবাস্ত সচীব ভাস্করের সঙ্গে দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে এক সম্পর্ধ শির। দীপিকার শিখা হতে বিচ্ছুরিত আলো যেন চন্দ্রকুমারীর হৃদয়ের পুঞ্জীভূত অন্ধকার স্পর্শ করে। দেখতে ইচ্ছে করে আরও ভাল করে। এই ইচ্ছার আবেগ সংবরণ করতে পারে না কুমারী চন্দ্র। ধীরে, যৌবনের প্রথম লজ্জাভারে মন্থর বনমৃগীর মত সতৃষ্ণ নয়নে এগিয়ে যেতে চায় চন্দ্রকুমারী কিন্তু পারে না। নবোদ্গত দূর্বাদলের উপর দাঁড়িয়ে গোপন নেপথ্য থেকে তার অভিসারভীরু হৃদয় সেই অনুপম অনুশোভাসুধা পান করতে থাকে।

অলিন্দ পার হয়ে চাতালে নেমে আসেন রঘুনাথ ও ভাস্কর। রাজ সন্নিধানে বার্তা নিবেদন করে আশুকর্তব্য আলোচনান্তে রাজপ্রাসাদের বহিঃদ্বারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ব্যস্ততায় চঞ্চল দুটি যুবা।

চলে গেলেন। কি বিশ্বাস নিয়ে। কি উদ্দেশ্যে, কোন কর্তব্য সাধনে রাজপ্রাসাদে রাজ সন্নিধানে এসেছিলেন এই অপরিচিত তা জানে না রাজকুমারী চন্দ্র। দূর্বাস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের উপান্তে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তার অন্তরে এক সঙ্কল্পের সঙ্গীত ধ্বনিত হতে থাকে।—প্রেমাকুল এই দুই বাহুর মালিকা যদি তোমার কণ্ঠে দেবার সুযোগ নাই আসে তবু বঞ্চিত করো না আমায়। ভঙ্গুর প্রাণ দীপ শিখার মত যদি নিভে যায় জীবনের দীপ, তবে যাবার আগে তোমার বক্ষে বরণ করে নিও তোমার প্রেমিকা নৃসিংহতনয়ার কামনা বিহ্বল নিঃশ্বাস।

প্রাসাদে ফিরে আসে চন্দ্রকুমারী। কক্ষের দীপ নিভিয়ে দিয়ে বাতায়নের কাছে এসে দাঁড়িয়ে। দূরে বনানী জ্যোৎস্নামোদিত। কানাই সায়রের প্রান্তে শীতল স্পর্শ সুখের তৃষ্ণা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খর ফাল্গুনী সূর্যে তাপিত প্রদ্যুম্নপুর রাজপ্রাসাদ।

শুনতে পায় না, তবু মনে হয় চন্দ্রকুমারীর দূরাগত এক ধাবমান অশ্বক্ষুর-ধ্বনির দমক তালে তালে আঘাত করছে তার তনুবল্লরী, যেন খর নখরালিম্পনে চিত্রিত হচ্ছে কুঙ্কুমরসে অনুলিপ্ত পয়োধর, সিতচন্দনে সুরভিত তনুলতা।

প্রাচীকপোলে নবস্ফুট লোধ্রের রেণু ছড়িয়ে দেয় শেষ ফাল্গুনের কৌতুক-সমীর।

আজ দোল।

প্রদ্যুম্নপুরবাসি আজ হোলি উৎসবে মত্ত হবে।

প্রভাতের নবারুণ প্রভা পান করার জন্য রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন দূর্বাসবুজ চাতালের

উপান্তে রাসমঞ্চের শিখর কেতন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সুন্দর শোভাময় হয়ে উঠেছে মন্দির প্রাঙ্গণ। নীলিমার শান্ত সমুদ্রের মত আকাশে হীরকপ্রভ সূর্য। দূর জনপদের কুটীর পংক্তি থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মেলা প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ করে তুলেছে ধীরে ধীরে। রাসমঞ্চের অভ্যন্তরে কেয়ূর কিঙ্কিণী ধাতুভূষিতা মনোহরা শ্রীরাধিকা মূর্তির শ্রীঅঙ্গ বেষ্টন ক'রে স্বচ্ছ অংশুক বসনে আবরিত মদালসমন্থর কৃষ্ণ। কষ্টিপাথরের শ্রীকৃষ্ণের বাহু বংশীধারী।

রাজপুরোহিতগণের পুষ্পাঞ্জলির পুষ্পের সৌগন্ধ বাতাসে ছুটোছুটি করছে। গম্ভীর মন্ত্রধ্বনিতে বিনোদিত বসন্ত প্রভাত।

কানাই সায়র আজ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে সকলের জন্য। গ্রামপ্রান্ত হতে মানুষের চলার ছন্দে কোন ছেদ নেই। কানাই সায়রে স্নান করে দেবদর্শনের পর রাজসন্দর্শন শেষে আবীরে কুমকুমে দেহ চর্চিত করে প্রীতি কুড়িয়ে প্রীতি ছড়িয়ে ফিরে যাবে জনপদবাসী আপন আপন গৃহে।

রাসমঞ্চের দক্ষিণ প্রান্তে কয়েকটি তমাল তরু ছায়ায় আকীর্ণ চাতালে পুষ্পদামে সজ্জিত একটি অস্থায়ী বেতস-মঞ্চ। ঐ মঞ্চ থেকে প্রদ্যুম্নপুরাধিপতি রাজা নৃসিংহদেব দুঃস্থ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করবেন আজ।

রাজপুরীর ঘণ্টাফটক থেকে যামঘোষী ঘণ্টা বাজে।

চঞ্চল হয়ে ওঠে মেলা প্রাঙ্গণে সমাগত প্রজাপুঞ্জ, স্নানার্থী এবং কর্তব্যরত রাজকর্মচারীবৃন্দ। ছুটে আসে চোপদার। ঘোষক তীব্রকণ্ঠে রাজাগমন ঘোষণা করে। দুর্গফটক থেকে প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীগণ পরিবৃত হয়ে বেরিয়ে আসেন রাজা নৃসিংহদেব। মনে হয় নিভৃত কানন হতে স্তব্ধিত কিংশুকের দ্যুতি রাসমঞ্চের উপান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। কাষায় বসনে আবৃতদেহ রাজা রাসমঞ্চের অভ্যন্তরে চলে গেলেন। বিগ্রহ প্রণাম করে রাজপুরোহিতের পদস্পর্শ করে আবীর ভূষিত করলেন রাজা।

আশীর্বাদধ্বনি উচ্চারণ করেন পুরোহিতগণ। পরক্ষণেই রাজা রাসমঞ্চের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে সমবেত প্রজাপুঞ্জ।

—রাজা নৃসিংহদেবের জয়। রাজা দীর্ঘায়ু হোক।

হাত প্রসারিত করে কৃতজ্ঞতা ছড়িয়ে দেন রাজা। তারপর সমবেত প্রজাপুঞ্জের মধ্য হতে একটি বালককে আহ্বান করে সুবর্ণ রেকাবী থেকে কিছু আবীর নিয়ে সমস্ত প্রজাপুঞ্জের প্রতিভূস্বরূপ সেই বালকের শুভ্র ললাট রঞ্জিত করলেন। উল্লাসিত বালকও সেই স্বর্ণ রেকাবী থেকে একমুঠো আবীর তুলে রাজার শুভ্র কেশদাম রঞ্জিত করে দিল। বিপুল হর্ষধ্বনিতে বিস্ফারিত হয়ে গেল প্রাঙ্গণ। রঙে রঙে রঙিন হয়ে উঠল মেলা প্রাঙ্গণ। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে রাজা ধীরে

ধীরে দানমঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। একান্ত সচীব ভাস্কর সিংহ একটি দীর্ঘ তালিকা নিয়ে রাজার পাশে দাঁড়িয়ে একে একে আহ্বান করতে লাগলেন। ছায়ার মত নিঃশব্দে রাজার চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে আছে অন্যান্য অমাত্য ও রাজকর্মচারীগণ।

মহামন্ত্রী একটি একটি ক'রে শুভ্র বস্ত্র তুলে দিচ্ছেন রাজার হাতে, রাজা উৎফুল্ল প্রজার হাতে তুলে দিচ্ছেন সেই বস্ত্র। প্রণাম ক'রে চলে যাচ্ছে একে একে হৃষ্টচিত্ত এক একজন রাজপুরবাসী। কৃতার্থ হয় তারা। মৃদুহাস্যে হৃদয়ের প্রসন্নতা মুক্ত ক'রে দিয়ে রাজার দীর্ঘায়ু কামনা করে তারা।

দ্বিপ্রহর হয়ে গিয়েছে। কানাই সায়রে স্নান করে দাবদাহের জ্বালা জুড়িয়ে নিচ্ছে নগরবাসি। মৃদঙ্গ, মন্দিরা বাজিয়ে নগর সংকীর্তন সমাপ্ত করে মন্দির প্রাঙ্গণে ফিরে এল গাইকের দল।

প্রার্থী জনতার হাতে হাতে বস্ত্র দান সমাপ্ত ক'রে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন রাজা নৃসিংহদেব।

হর্ম্যতলে অপেক্ষমান রাজপুরুষগণ একে একে রাজার পদপ্রান্তে আবীর প্রলিপ্ত করে প্রণাম করছিল। রাজার দুই চোখে বিচিত্র এক সুখের বর্ণালী নর্তিত হতে থাকে। সস্নেহ আগ্রহে আরক্ত আবীরের তিলক কপালে লেপন করে দিতে দিতে মৃদুস্বরে—আশীর্বাণী উচ্চারণ করছিলেন রাজা। ধীরে ধীরে শূন্য হয়ে যায় হর্ম্যতল। অন্তঃপুর অভিমুখে ফিরলেন রাজা। বিশ্রামাগারের বর্ণান্বিত আলিম্পিত দ্বার পতাকার ওপারে প্রাসাদ রমণীগণ তাঁর পদস্পর্শ করে আবীর লেপন করে প্রণাম নিবেদন করবার জন্য অপেক্ষারতা।

—পিতা!

নীরব; শিলীভূত বৃক্ষের মত সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন রাজা। পরিণত পুরুষ কণ্ঠে পুত্রস্নেহ বুভুক্ষিত উষ্ণ অন্তরে পুত্রস্নেহ মন্দাকিনীধারা জাগিয়ে আবার সে ডাকে।

—পিতা।

সস্নেহ আগ্রহে ফিরে দাঁড়ান রাজা নৃসিংহদেব।

—রঘুনাথ?

—হ্যাঁ পিতা, আমার দেরী হয়ে গিয়েছে। নত হয়ে রাজার পদপ্রান্তে আবীর লেপন ক'রে প্রণাম করেন রঘুনাথ।

রঘুনাথের শির চুম্বন করেন রাজা।

চমকে ওঠে আর একজন। উল্লাসচপল অথচ নিবিড় কোমল হর্ষান্বিত এক অদৃশ্য স্পর্শের উৎসব হঠাৎ এসে দ্বারপ্রান্তে সুযৌবনা রাজতনয়া চন্দ্রকুমারীর বুকের উপর আছড়ে পড়ে। উৎকর্ণ হয়ে শোনে চন্দ্রকুমারী, দুটি চলোচ্ছল চরণের মঞ্জির ধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে গেল।

দ্বারপথে প্রবেশ করলেন রাজা।

ভাববিচলিত সাগ্রহ দুই বাহুর তলায় পিতৃবক্ষ বেষ্টন ক'রে পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে চন্দ্রকুমারী। যেন পিতার বিশাল বক্ষঃপটের উপর লুটিয়ে পড়ে শান্ত হতে চায় তার স্তবকিত কুন্তলের বেদনা।

—কি হয়েছে কন্যা? পিতার কণ্ঠস্বরে দুঃসহ বিস্ময় চমকে ওঠে।

চকিতে পিতার চরণে লুণ্ঠিত হয় চন্দ্রকুমারী। পিতার পায়ের উপর এইমাত্র যে দিব্যগন্ধ আবীর প্রলিপ্ত হয়েছে তা দুই ওষ্ঠ দিয়ে স্পর্শ করে সে। তার ধমনীধারায় এক স্বপ্নাতুর আকাঙ্ক্ষা ছুটোছুটি করে।

পদপ্রান্ত থেকে তুলে আদরিণী কন্যার শির চুম্বন করেন রাজা।

অকারণ বাষ্পাসারে প্লাবিতা হয় চন্দ্রকুমারীর দুই চক্ষু। নত নেত্রে কক্ষ ছেড়ে চলে যায় কন্যা চন্দ্রকুমারী।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন রাজা নৃসিংহদেব।

সম্মুখে রানী সনকাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেদনার্ত দৃষ্টি তুলে বলেন।

—সত্যই আজ বড় দেরী হয়ে গিয়েছে সনকা।

গভীর রাতে নীরব রাজ অন্তঃপুরে ক্ষীণ দীপালোকে দুইটি পৃথক শয্যায় এখনও জেগে আছে রাজকন্যা চন্দ্রকুমারী আর সহচরী প্রমদা। বাইরে মসীলিপ্ত হয়েছে কৃষ্ণদিগন্ত। মেঘপুঞ্জ এসে ঢেকে দিয়েছে চন্দ্রমণ্ডল। বাতায়ন পথে রাজপুরীর গৃহসমূহ, মন্দিরচূড়া দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হতে থাকে।

রাত নিঝুম।

প্রাসাদ দ্বারে, দুর্গফটকে, তোরণে নিঃশব্দ পদক্ষেপে ভল্লধারী নিশাচর প্রহরীর দল ঘোরাফেরা করে।

সহসা মেঘগর্জন তোলে গুরু-গুরু।

শয্যা পাশে বিনিদ্রিতা প্রমদা। প্রদীপের কম্পমান শিখায় চন্দ্রকুমারীর দেহশোভা বিচ্ছুরিত হতে থাকে।

ধীরে ধীরে উঠে বসে প্রমদা।

—দীপের আলো কি চোখে লাগছে প্রমদা? ঘুমোয়নি চন্দ্রকুমারী।

এক স্বপ্নময় অনুভবের মধ্যে তৃষ্ণায়িত চক্ষু মেলে ছিল চন্দ্রকুমারী।

—না সখী তা নয়। প্রমদার দুই নয়নে এক শীতসন্ধ্যার বেদনা-শিশির সঞ্চারিত হয়।

—তবে?

বাইরে তখন টুপ টুপ বৃষ্টি। বিলম্বিত ছন্দে বর্ষণ সুরু হয়েছে। দূরের

আকাশ মেঘমল্লারের ঝঙ্কারে মুখর। প্রমদার বক্ষঃপুটে অনুরাগের শোণিমা আকুলিত হয়। সকল শাসন দীর্ণ করে দিয়েছে মেঘডম্বরু।

—আমায় একটিবারের জন্য বাইরে যেতে দে সখী।

অভিসারচারিণীর বক্ষজবাসনা সুপীন বিহ্বলতায় ভেঙে পড়ে।

—সে কি তোর কণ্ঠে মাল্যদান করবে প্রমদা?

ক্ষণোদভ্রান্ত শোনা যায় রাজতনয়ার নম্রস্বর।

—নিশ্চয়ই।—স্নিগ্ধ হর্ষের জ্যোৎস্না ফুটে ওঠে প্রমদার সমস্ত মুখমণ্ডলে। মুক্ত বাতায়ন পথে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে। বাতাসে আর্দ্রতার আভাস মেলে।

—তবে যা। প্রেমলুব্ধা হৃদয় বুঝি আর একটি প্রেমকে প্রণয় তৃপ্ত স্বপ্নে ভরে দিতে চায়। অভাবিত বিস্ময়ে নম্র হয়ে যায় প্রমদার দৃষ্টি। দীপালোকে মণিময় দীপিকার মত রূপরম্যা দুইটি কুমারী হৃদয় অনুরাগের আলোকে ভরে ওঠে। বিশাল তৃষ্ণ আলিঙ্গনে নিপীড়িত হয় স্তনভারভীরু দুটি নারী বক্ষ।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্তা হয়ে আসে প্রমদা।

সিক্ত রাত্রি। মৃদু শীতার্ত বাতাস রাজপুরীর গৃহে গৃহে সুখতন্দ্রা উপহার দিয়েছে।

দুর্গফটকে যামঘোষী ঘণ্টাধ্বনি রাত্রির জড়তা ছিন্ন করে সদ্য জাগরণের বিভ্রান্তি ছড়ায়। বনতরুর শিখরে শিখরে ঝর ঝর ঝরে বারিধারা।

শতকামনার পুষ্পদল বুকে নিয়ে বিনিদ্র ছিলেন ভাস্কর। মেঘমেদুর আকাশে নবজলবণার উৎসব বৃথা। বৃথা এই ব্যর্থ যৌবন সজল বর্ষণ। বাতায়নে বসে ভাস্করের অন্তরাত্মা দুঃসহ বিরহে চঞ্চল হয়ে ওঠে। বক্ষের গভীরে গোপনে সঞ্চিত এক মধুর অনুভবে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হতে থাকেন ভাস্কর সিংহ। দীপ নিভে যেতে চায়।

দ্বারে আঘাত পড়ে। দ্বার খুলে দাঁড়ান ভাস্কর সিংহ।

—আমি এসেছি ভাস্কর। তৃষ্ণাভিমানিতা প্রমদা দ্বারে দাঁড়িয়ে। স্বপ্নোত্থিতের মত হঠাৎ উন্মীলিত দুই চক্ষুর বিস্ময় নিয়ে প্রমদার দিকে তাকান ভাস্কর। ঊর্ধ্বাকাশের বারিধারা ইতিমধ্যে প্রমদার সুকোমল বক্ষ চুম্বন করে শ্বেতচন্দনের পত্রাবলী মুছে নিয়েছে। সূক্ষ্ম বস্ত্র সিক্ত করে অনাবৃত করেছে বরাঙ্গের বিকচ শোভা।

—প্রমদা!

—ভাস্কর!

সেই মুহূর্তে বিদ্যুল্লেখার মত চকিতে ভাস্করের আলিঙ্গনে সমর্পিততনু প্রমদার তৃষিতাধর ভাস্করের চুম্বন লুণ্ঠন করে নেয়। যৌবনভারে মন্দীভূত দেহের প্রথম লজ্জায় পুষ্পবতী প্রমদা সমুদ্রের কামনা স্পন্দিত ভাস্করের সুগঠিত

দেহতট থেকে কৌতূহলের মূর্চ্ছনা ঝংকৃত করে নিতে চায়। কিন্তু হঠাৎ কুণ্ঠিত হন ভাস্কর সিংহ।

—অনূঢ়া প্রমদা বল কি আমাদের অধিকার?

—ভালবাসার অধিকার, প্রেমের অধিকার।—রূপরম্যা কুমারীর হৃদয়ের অনুরাগ বাতায়ন পথে মেঘাবৃত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভূমিলুণ্ঠিত বসনাঞ্চলের উপর পা ফেলে পালঙ্কের কাছে এসে দাঁড়ায় প্রমদা।

—নির্ভয় হও ভাস্কর আমি আজ আকনাদির পত্র মন্থন করে সেবন করে এসেছি।

সুভীরু বাসনার শিহরণে প্রমদার প্রসারিত কোমল বাহুলতার মধ্যে ধরা পড়েন ভাস্কর সিংহ।

বিদ্যুতস্ফুরিত হয়ে স্পর্শ মহোৎসবে মেঘগর্জন করে।

দীপ নিভে যায়।

বৃষ্টি নামে।

হোলি উৎসব সমাপনের পর মৃগয়াভিলাসে মেতে উঠলো প্রদ্যুম্নপুরের পৌরুষ ও ঐশ্বর্য প্রাচুর্যে ঝলমল রাজগৃহ। ঘনসংবদ্ধ জনবসতি বেষ্টিত নগর বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু থেকে পরিধি পর্যন্ত সর্বত্র ঘোষক ঘোষণা করছে রাজ আহ্বান।

ইচ্ছুক রাজকর্মচারী ও অমাত্যগণ এমনকি সমৃদ্ধ নগরবাসী মৃগয়াভিযানে রাজার সঙ্গে যোগ দিতে পারে।

কয়েক দিন পর মেঘের অন্ধকার অপসারিত হয়ে বর্ষণধৌত আকাশে তারাগুলি উজ্জ্বল; প্রাসাদের দীপরশ্মি অধিকতর লাবণ্যে ঢলঢল। তোরণের স্তম্ভশীর্ষ থেকে মুরজমুরলীর আগমনী সুর ভেসে আসছে। মন্ত্রণা কক্ষে বিশিষ্ট রাজ-কর্মচারী ও অমাত্যগণ রাজার নিকট হতে নানা বিষয়ে জেনে নিচ্ছেন। রাজার অনুপস্থিতিতে যাতে না রাজকার্য ব্যহত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই নানা কার্য-তালিকা বিভিন্নজনকে বুঝিয়ে দিলেন রাজা নৃসিংহদেব।

রাজপুরীতে প্রহর ঘন্টা বাজে। মহারাজ সান্ধ্য সভা ভঙ্গ করলেন। রাজ-কর্মচারী, অমাত্য সভাসদ সকলে রাজাকে অভিবাদন করে একে একে বিদায় নিচ্ছেন।

সেনাপতি কংসারী প্রসন্ন চোখে মহারাজকে একবার জিজ্ঞাসা করলেন।

—কাল কখন যাত্রা করবেন মহারাজ? নিতান্ত অনুগতের মত উৎসুক কণ্ঠস্বর।

মহারাজ নৃসিংহদেব তাঁর আননশোভা বিস্তার করে সেনাপতির দিকে হঠাৎ অপাঙ্গে চাইলেন। যেন উপলব্ধি করতে চান সেনাপতির মনগত অভিপ্রায়।

—অতি প্রত্যুষে কেন না..., রাজা যেন ইচ্ছে করেই আর একবার

মৃগয়াভিযানের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান বুঝিয়ে দিতে চান সেনাপতি কংসারীকে।

—আমার রাজ্যসীমার দক্ষিণ-পূর্বের দুর্ভেদ্য অরণ্যে এবার মৃগয়াভিযান সূচিত হবে। রাজ্যসীমা হতে অর্ধক্রোশ দূরে স্রোতস্বিনী যেখানে বিক্ষুব্ধ জলভূমি রচনা করেছে সেখান দিয়েই আমাদের বনমধ্যে প্রবেশ করতে হবে।

—এ অতি উত্তম সিদ্ধান্ত মহারাজ। সমর্থকের ভূমিকায় সু-অভিনেতার মত মস্তক আন্দোলিত করে কংসারী।

—তুমি তোমার সুগঠিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজধানীতে যখন থাকছ; তখন পিছনের চিন্তা নিরর্থক।

যেন চরম নিশ্চিন্ততার ছায়া খেলে রাজার মুখাবয়বে। ধীরে সিংহাসন থেকে নেমে আসেন তিনি।

—এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হোন মহারাজ। রাজ্যের সামগ্রিক চিন্তামুক্ত মনে আপনি মৃগয়াভিলাষ পূর্ণ করুন মহারাজ। রাজাকে পুনর্বার অভিবাদন করে নিজের মনগত অভিপ্রায় প্রকাশ না করে যতটা জানা দরকার জেনে নিয়ে ধীরে বিদায় নেয় সেনাপতি কংসারী। রাজা পুনরায় সিংহাসনের উপর কিংখাবের আসনে বসে দৌবারিককে আহ্বান করে ইঙ্গিত করতেই ভাস্কর ও অপর দুইজন বিশ্বস্ত অমাত্য কক্ষে প্রবেশ করল।

একফালি চাঁদের আলো অলিন্দচ্যুত হয়ে হর্ম্যতলে লুটিয়ে পড়েছে। স্থির কণ্ঠে রাজা জানতে চান।

—সব প্রস্তুত?

অভিবাদন করে সম্মতিসূচক ভঙ্গীতে মস্তক আন্দোলিত করে উত্তর দেন একান্ত সচীব, বীর যোদ্ধা, বিশ্বস্ত ভাস্কর সিংহ।

—হ্যাঁ মহারাজ। সব প্রস্তুত।

—রঘুনাথ? আরো নিশ্চিন্ত হতে চান রাজা।

—পরিকল্পনা মত ঝটিকা বাহিনী নিয়ে সে নিজ গ্রামে সতর্ক প্রহরায় প্রস্তুত থাকবে মহারাজ।

—তারপর? আক্রমণ সূচিত হলে? রাজা যেন আর একবার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন প্রিয় বিশ্বস্ত সমর নায়কদের।

—দিবাভাগে হলে ভেরী নিনাদে, আর রাত্রিতে আক্রমণ সূচিত হলে, অগ্নিশিখার সাহায্যে দ্রুত আমাদের কাছে সংবাদ পেঁাছে যাবে মহারাজ।

—উত্তম। স্বর্ণদীপ্ত মুখখানি প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো রাজা নৃসিংহদেবের।

বিবৃতি শেষ করে অভিবাদন করে সঙ্গীদের নিয়ে কক্ষ ছেড়ে চলে যান ভাস্কর সিংহ।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন রাজা নৃসিংহদেব। ইতিমধ্যে প্রাসাদ দীপমালায় সজ্জিত হয়েছে। কিছুক্ষণ আগেই মন্দিরের প্রার্থনা সঙ্গীত নীরব হয়ে গিয়েছে। রাণীর কক্ষে প্রবেশ করলেন রাজা। স্বর্ণ পর্যঙ্কে উপবিষ্টা রাণীর ব্যজনীকা কিংকরী রাজাকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল।

চমকে উঠলেন রাণী সনকা। সন্ধ্যায় চয়িত কুন্দের মালা নিজ কণ্ঠ হতে খুলে রাজার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে পালঙ্কের উপর বসিয়ে রাজার মুখপানে চাইলেন রাণী। দেখলেন রাজার চোখে কৌতূহল নেই অথচ যে চক্ষু সর্বদা কৌতূহল-দীপ্ত থাকে।

—কি হয়েছে রাজা?

—কাল মৃগয়াভিযান মনে আছে রাণী?

—হ্যাঁ মহারাজ, মনে আছে,—যেন জীবনের নির্বাসিত কামনার বেদনা অনুভব করে সনকা—তবু তুমি তো তৃপ্ত হও রাজা?

—তোমার সান্নিধ্য আর তোমার স্পর্শই আমার পরিতৃপ্তি রাণী।

—তবে? অভিমান স্ফুরিত হয়ে ওঠে রাণীর কণ্ঠ।

—এ রাজবিধি, এ লঙ্ঘন করা যায় না সনকা।

—এ কয়দিন পক্ষহীন বিহগের মত, তৈলহীন দীপের মত এ রাজপ্রাসাদ নিরানন্দ থাকবে রাজা।

কাঁদছিলেন রাণী সনকা।

শান্ত দৃষ্টি তুলে সনকার দিকে তাকিয়ে থাকেন রাজা। ধীরে ধীরে কর্তব্য-দৃঢ় হয় তাঁর দৃষ্টি।

—শান্ত হও রাণী। কন্যা চন্দ্রকুমারী ও কন্যা-সহচরী প্রমদাকে আহ্বান কর।

—কেন রাজা? বিস্মিত হন রানী সনকা।

—তোমাদের কিছু বলবার আছে। একান্ত গোপন।—স্তব্ধ হয় রাজার কণ্ঠস্বর।

করতালি দিয়ে দ্বারপালিকাকে আহ্বান করেন রাণী সনকা। বিচলিত নিঃশ্বাসে কম্পিত হয় বক্ষবাস। দ্বারপালিকাকে কন্যা চন্দ্রকুমারী ও প্রমদাকে আহ্বান করতে বলে রাজার সম্মুখে দারুবেদিকায় বিস্ময় কম্পিত দেহে বসে রইলেন রাণী সনকা।

ভীরুভ্রূলতা ও স্মিতান্বিত অধর সংযত করে পিতার কাছে এসে দাঁড়ায় রাজকন্যা চন্দ্রকুমারী। রাণী সনকার পাশে নিশ্চুপ প্রমদা। কেতকীগন্ধে পীড়িত হয় কক্ষতল।

—শোন কন্যা,—সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে আবার বলেন রাজা।

—এক কঠোর পরীক্ষা জীবনে স্বীকার করে বিশ্বাসের দুঃসাহস বুকে নিয়ে কাল প্রত্যূষে আমার মৃগয়াভিযান সুরু হবে।

—কি হ'য়েছে পিতা?—চিন্তাবিহ্বল চন্দ্রকুমারীর কণ্ঠস্বর।

—অবগত হয়েছি, আমার অধীনস্ত যোতবিহারের সামন্তরাজ প্রতাপনারায়ণ আমার মৃগয়াভিযানের সুযোগ নিয়ে রাজপুরী আক্রমণ করবে, পশ্চাতে থাকবে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি কংসারী।

—ষড়যন্ত্র?—বিসর্পিল ভ্রূভঙ্গে প্রশ্ন জাগে চন্দ্রকুমারীর।

—হ্যাঁ কন্যা। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ ফাঁস হয়ে গিয়েছে। সমগ্র তথ্য সংগ্রহ করে এনেছে রাজশুভানুধ্যায়ী নবীন যুবক রঘুনাথ।

—রঘুনাথ। প্রশ্নিল রাণীর কণ্ঠস্বর।

—হ্যাঁ রঘুনাথ। বিশ্বাসের দুঃসাহসে গুরুত তারই পরিকল্পনায় রচিত হতে চলেছে মৃগয়াভিযানের মাধ্যমে প্রদ্যুম্নপুরের এক নতুন ইতিহাস।

—পিতা। হর্ষারুণ উদিত আদিত্যের রশ্মিপাতে প্রাচীপট যেমন আলোকিত হয় তেমনি আলোকিত হয়ে ওঠে চন্দ্রকুমারীর কণ্ঠস্বর।

—সবকিছু তোমাদের জানিয়ে রাখলাম। সংবাদ গোপন রাখবে। প্রস্তুত থাকবে যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে। ভয় নেই। আশ্বাসবাণী ঝরে পড়ে রাজার কণ্ঠে।

দূর বনান্তরে শৃগাল সমস্বরে ডাকে।

চমকে ওঠেন রাণী সনকা।

বাতায়ন পথে তাকিয়ে থাকেন রাজা নৃসিংহদেব। দূরে বিশাল অরণ্যের বুকে থমথমে আঁধার। গ্রামপ্রান্তে আঁধারে ঢাকা কুটির পংক্তির মধ্য থেকে দু' একটা টিম্‌টিম্‌ আলো দেখা যায়। আরও দূরে ছম্‌ছম্‌-অন্ধকারের অতলে একটা গুঁড়িতে আগুন জ্বলছে বোধ হয়।

ফিরে দাঁড়ালেন রাজা।

কন্যাদ্বয় কক্ষ ছেড়ে চলে গিয়েছে।

উদ্বিগ্না রাণী সনকা।

চিন্তিত রাজা নৃসিংহদেব।

আলো ঝলমল রাজপুরীর বুক্ষশোভিত রাজপথের দুপাশে সারিবদ্ধ বিপণী-শ্রেণী পার হয়ে পানশালায় এসে দাঁড়ালো সেনাপতি কংসারী। মত্ত উল্লাসের ফোয়ারা মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ সেনাপতিকে দেখে অভিবাদন করে এদিক ওদিক সরে পড়লো দুচার জন। অন্যমনস্ক ছিল কংসারী। দূরে ছুরুজ

অন্ধকারে অপসৃয়মান ব্যক্তিটির দেহ ক্রমে ক্রমে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে বুক উজাড় করে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে কংসারী। যাক রাজধানী থেকে পত্র নিয়ে ঐ দূত এবার নিশ্চিন্ত ভাবে পেঁৗছে যাবে যোতবিহারে। আর একটু পরেই ছায়া ছায়া অন্ধকারের পটভূমিতে আরও নিকষ কালো অন্ধকার নেমে আসবে। সেই আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে অবলীলাক্রমে সংবাদ বহন করে নিয়ে যাবে কংসারীর বিশ্বস্ত অনুচর। নগরীর সমারোহের দিকে তাকিয়ে মনে মনে আগামী কাল রাত্রিতে যে চিত্র ফুটে উঠবে তার চিন্তা করতে করতে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো কংসারী। মিটি মিটি হাসতে লাগল কংসারী। গলা নামিয়ে ঢুকে পড়লো পানশালায়। ভীত হয়ে উঠলো শ্রেষ্ঠী। দ্রুত ভৃঙ্গারে সুরা পূর্ণ করে এগিয়ে দিল সেনাপতির দিকে। অশান্ত হৃদয় শান্ত করবার জন্য হঠাৎ কর্মব্যস্ত হয়ে নানা কাজে ব্যস্ত করে তুলতে চাইল নিজেকে। কংসারী উঠে দাঁড়াল। আভূমি নত হয়ে অভিবাদন করল শ্রেষ্ঠী। সেদিকে মন ছিল না। দ্রুতপদে বাইরে বেরিয়ে এসে অশ্বারূঢ় হল সেনাপতি কংসারী। দুর্গফটকে এসে দাঁড়ালো। অভিবাদন করল দুর্গরক্ষক। কোন কথা না বলে একজন মশালধারী প্রহরীকে ইঙ্গিতে আহ্বান করে অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়ে নিয়ে অশ্ব ছুটিয়ে দিল কংসারী। মশালের আলোয় সরে সরে যাচ্ছে পাতাবাহার মল্লিকা বেল জুঁইয়ের সবুজ ঝাড়। রাজোদ্যানের মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত নির্জনে রাসমঞ্চের সম্মুখে অশ্বের গতি রুদ্ধ করে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে পড়ল কংসারী। মশালধারী অনুসরণ করে তাকে।

কোথায় ডাকছে রাতজাগা পাখি। ঘুমন্তপুরীর মাঝে কিসের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে কংসারী? তার মন আজ খুশীতে ভরপুর। জীবনের সবচেয়ে বড় চাওয়া পূরণ হতে আর কতই বা দেরী? দুর্দান্ত হিংস্র পশুর মত তির্যক দৃষ্টিতে দূরে রাজপ্রাসাদের দিকে তাকায় কংসারী। কবে? কখন আসবে পাওয়ার সেই চরম মুহূর্ত? রাজতনয়া চন্দ্রকুমারীর উষ্ণ নরম স্পর্শ কবে তার শিরা-উপশিরায় ঝড়ের মাতন তুলবে? চোখের তারা দুটো কাঁপতে থাকে কংসারীর। রক্তলোভী হিংস্র হায়নার মত কামাতুর কংসারী রাসমঞ্চের উন্মুক্ত অলিন্দে বনচারী কাঠুরিয়াদের ঘুমন্ত শরীরের উপর ঝুঁকে পড়ে। মশালধারী, সেনাপতির তির্যক দৃষ্টির সামনে পড়ে মনের সব শক্তি হারিয়ে ফেলে। সে বুঝতে পেরেছে তার কর্তব্য। সরে সরে ঘুমন্ত দেহ থেকে দেহান্তরে মশালের আলো দেখিয়ে যায় হতভাগ্য নৈশপ্রহরী নিরাসক্ত নিস্পৃহের মত।

জ্বলজ্বলে অস্বাভাবিক দৃষ্টি ফেলে চেয়ে থাকে কংসারী। একের পর এক নারীদেহ অন্বেষণ করে তার চোখ। অবশেষে, এক ঘুমন্ত সদ্য যৌবনা কুমারীর শরীর শোভা পান করতে থাকে কংসারী। মশাল হাতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মশালধারী। দেহজোড়া দৈন্যের মাঝে মুখের হাসিটুকু শান্ত মাধুর্যে ভরে

রয়েছে। দেখছে কংসারী ; আবরণ লুটোচ্ছে মর্মর মেঝেতে। কোমল বক্ষে বস্ত্রের বাঁধন নেই। সুগোল উরু। উন্মুক্ত লোভনীয় খাঁজে শরীরের গোপন অঙ্গ।

মশালের আগ্নেয় আলোয় কংসারীর বীভৎস বঙ্কিম ওষ্ঠের পাশ থেকে সীৎকারের ধ্বনি শোনা যায়। প্রহরীর হাত থেকে মশাল নিয়ে ইঙ্গিত করে কংসারী। ডান হাতে খোলা তরোয়াল।

মুহূর্ত মাত্র।

ঘুমন্ত সেই শরীর শোভা জেগে উঠবার আগেই তার মুখে বন্ধন পড়ে।

রাজোদ্যানের নিভৃতে এক পত্রচ্ছদ তমালের নীচে সেই দেহ বহন করে আনে নিরুপায় প্রহরী।

আবার মশাল হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাকে।

কাঁপে কামিনী।

কংসারীর আদিম বন্যরক্ত দোলে। কামান্ধ কংসারীর ভুজ-ভুজঙ্গম কুমারীর উদ্ধত স্তনে অবহেলায় খেলা করে। সকল অনুনয় ও প্রতিবাদ রূঢ় আক্রমণে স্তব্ধ করে দিয়ে সেই কুমারী তনুর যৌবন ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মত দলিত করে, মথিত করে উপভোগ করে লালসার বিষ ঢেলে দেয় কংসারী।

রাত্রি নিথর হয়ে আসে।

নিথর হয় কুমারী তনু।

নিথর হয় খণ্ডিত মস্তক প্রহরীর দেহ। মশাল মাটিতে পড়ে দপ্‌দপ্‌ করে ; তরবারির মুখ দিয়ে ছিট্‌কে পড়ে তাজা রক্ত। শ্বাপদ লালসাজ্বলা চোখে তরবারি কোষবদ্ধ করে কংসারী। কেবল রাতের অন্ধকার সজীব হয়ে ওঠে।

* * *

সদ্যোজাগ্রত বিহগের কল-কাকলীতে শিহরিত হয়ে উঠেছে প্রদ্যুম্নপুর রাজ্য। ধীরে ধীরে আপ্লুত হয়ে উঠেছে পূর্বগগন। সীমান্তে দীর্ঘায়িত বনানীর তরুশীর্ষে হাজারো মাণিক ঝলমল করে উঠছে যেন।

রাজপ্রাসাদের দুর্গফটকের স্তম্ভশীর্ষে সানাই বাজে।

আজ রাজার মৃগয়াভিযান।

অতিথি-ভবনে শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণগণ ও বেশ কিছু পুরবাসি ইতিমধ্যেই উপস্থিত হয়েছেন, পরিচারকগণ তাঁদের মধ্যে শীতল তক্র পরিবেশন করছিল।

রাজপুরী আজ জেগে উঠেছে। পৌর পরিজন নানা আয়োজনে ব্যস্ত। একান্ত সচীব ভাস্কর ও রাজার মনোনীত কয়েকজন অমাত্য দুর্গফটকের সন্নিকটে রাজার আগমনের জন্য দেহরক্ষী হিসাবে প্রায় এক সহস্র সৈনিককে প্রস্তুত করতে ব্যস্ত ছিল। অশ্বারোহী, তীরন্দাজী ও অসিনিপুণ সৈন্যগণ আনন্দ প্রকাশের উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে রাজার নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছিল।

ইতিমধ্যে রাজসেনাপতি কংসারী একান্ত অনাড়ম্বর ভাবে রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছে। মহামন্ত্রীর পরামর্শে রাজার অনুপস্থিতিকালে রাজ্যের সার্বিক দায়িত্ব বহন করবে সেনাপতি কংসারী। রাজপুরীর বহিঃদ্বারে রাজ-অনুগমনের জন্য রাজার অনুগত এত সংখ্যক সৈন্য জমায়েত দেখে কংসারীর মন প্রসন্ন হয়ে উঠলো। রাজনীতির সতরঞ্চ খেলায় পাশা পড়েছে মাত্র। গজ নৌকো ঘোড়া ছাড়াই শুধু বড়ে দিয়েই কিস্তি মাৎ করবে কংসারী। তার ওষ্ঠে মৃদু হাসি স্ফুরিত হয়ে ওঠে।

অবশেষে রাজঅন্তঃপুর থেকে বিদায় নিয়ে রাজা নৃসিংহদেব রথারূঢ় হলেন। তুরী, ভেরী, কাড়া, নাকাড়া বাজিয়ে অভিনন্দিত করল সৈন্যকুল।

দুর্গতোরণে বেজে উঠলো মাঙ্গলিকী।

প্রাসাদের দীর্ঘ অলিন্দ দিয়ে ধীরপায়ে প্রাসাদশীর্ষে উঠে এলেন রাণী সনকা, ইতিমধ্যেই রাজকুমারী চন্দ্র ও প্রমদা প্রাসাদশীর্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। চিন্তার ভারে অবসন্ন মন রাণী সনকার। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে দেহ। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন রাণী সনকা। মন্দিরের চাতালে একদল ছেলেমেয়ে হুল্লোড় করছে। ফটকের বাইরে পুরবাসীগণ দাঁড়িয়ে মৃগয়াভিযাত্রী রাজকীয় শোভাযাত্রা দেখছে। সমাহিত মূর্তির মত স্তব্ধ ও নিঃশব্দ রাণীর দৃষ্টি দূরে অপসৃয়মান অভিযাত্রীদলের উপর নিবদ্ধ হয়। তখনো রাজরথের উড্ডিয়মান রথকেতনের নিবিড় ধবল রঙ চেনা যাচ্ছে। আনমনা হয়ে পড়েন রাজমহিষী সনকা। তারপর হঠাৎ যেন নিজের বক্ষের তপ্ত নিঃশ্বাসের আঘাতে চঞ্চল হয়ে ওঠেন রাণী। পাশবদ্ধ বনকুরঙ্গীর মত অসহায় মনে হয় সম্মুখে দণ্ডায়মানা কন্যাদ্বয়কে। বর্ষীয়সীর মসিনিবিড় ভ্রূপতাকা আর দুই মদিরাক্ষীর ভ্রূভঙ্গ এক উদ্‌ভ্রান্তির বন্ধনে নিকট সান্নিধ্য রচনা করে।

বনচরী মৃগীর মত মৃগয়াজীব ব্যাধের কল্পিত পদশব্দের আশঙ্কায় চঞ্চল হয় চন্দ্রকুমারী।

—কি হবে মা! ব্যথিতা ভীতা চন্দ্রকুমারীর দুই বাষ্পাকুল চক্ষু।

—ভয় নেই। দূরদিগন্তে দৃষ্টি প্রসারিত করেন রাণী সনকা।

অরণ্যের অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে মৃগয়াভিযাত্রী দল। আকাশে সুশ্বেত মেঘের বক্ষের পরমাণুর মধ্যে যেন ক্ষাত্রবলদর্প চূর্ণকারী রাজা নৃসিংহদেবের গৌরব কিরীটের ছায়া দোলে। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে হৃদয়ের উদ্বেগ।

সীমান্তে ক্ষীণ দুই স্রোতস্বিনী যেখানে জলভ্রমী রচনা করেছে সেইখান থেকে সঙ্কীর্ণ তট অতিক্রম করেই বনস্পতির পরিপতিত পরাগে পাটলীকৃত

বনভূভাগ। এখানে পেঁাছেই সমস্ত সৈন্যগণকে একত্রিত করে সম্ভাব্য আক্রমণের সংবাদ প্রচার করে দিলেন রাজা নৃসিংহদেব। এই সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত আলোড়ন সৃষ্টি হল। বিশ্বাসঘাতক শত্রুরক্তে স্নান করবার জন্য সৈন্যগণ অনলশিখ তৃষ্ণা নিয়ে সেই আলোছায়ার রহস্যে ঘেরা বনতলে উৎকণ্ঠ অপেক্ষায় প্রহর অতিক্রম করতে লাগল। ক্রমে সূর্যালোক পত্রচ্যুত হয়ে পূর্বাভিমুখি দীঘল ছায়া ফেলতে লাগল। তিনজন অগ্রদূত স্রোতস্বিনীর তীরে উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করে রাজধানীর দিকে লক্ষ রেখে অবিচল রইল।

অপেক্ষা।

অস্থির অপেক্ষা। ক্রমে কুলায় প্রত্যাশী বিহগের সংঘবদ্ধ আলাপন বৃদ্ধি পেতে লাগল। ক্রমে বনানীর শান্ত বনবীথিকার ছায়াকীর্ণ ধূলি অন্ধকারে আবরিত হল। সেনাদলের ছাউনির পূর্বদিকে একটি প্রশস্ত চাতালে দ্রুত আহারপর্ব সমাপ্ত করা হল। রাজা কিছু ঘৃতপক্ক অন্ন ও দ্রাক্ষাসার গ্রহণ করলেন।

সৈন্যগণ প্রস্তুত হয়ে যখন অরণ্যভূমি ত্যাগ করে সেই ক্ষীণ স্রোতস্বিনীর তটে এসে দাঁড়ালো তখন অন্ধকারে আবৃত হয়ে গিয়েছে সারা জগৎ।

স্রোতস্বিনী অতিক্রম করে রাজধানীর উপান্তে নিবন্ধ অন্ধকারের মধ্যে সৈন্য-সজ্জা করে নিল ভাস্কর এবং অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষগণ। দূরে প্রদ্যুম্নপুর রাজপ্রাসাদের ক্ষীণ আলো দৃষ্টিগোচর হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে রাতের তারাগুলিও মেঘাবৃত হয়েছে। আরো দূরে দিগ্বলয়ে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক ভূমিপ্রান্ত ছুঁয়ে ঝিলিক দিচ্ছে। আবার দ্বিগুণতর অন্ধকার নেমে আসে। সেই জমাট অন্ধকারে হাজারো চক্ষু লাউগ্রামের প্রান্ত লক্ষ্য করে অস্থির চাঞ্চল্যে অপলক।

সূচীভেদ্য অন্ধকারে সুদক্ষ নবীন সৈন্যসাথীদের নিয়ে প্রান্তরের উপান্তে অতন্দ্র রঘুনাথও চাঞ্চল্য অনুভব করেন।

অকস্মাৎ।

দ্রুত ছন্দবদ্ধ শব্দ। অশ্বারোহী। এক ঝিলিক আলোয় দেখা যায় যোতবিহারের প্রান্তর পথ দিয়ে কে যেন বেগে ছুটে আসছে। একা। অগ্রদূত।

হঠাৎ উৎকর্ণ হয় অশ্বারোহী। অশ্বের গতি দ্রুত করতে চায় কিন্তু মূর্তিমান মৃত্যুর মত সামনে থেকে তার পথ রুদ্ধ করলেন রঘুনাথ ও তাঁর অশ্বারোহী সঙ্গীদল। আগন্তুক মুহূর্তমধ্যে কোষবদ্ধ তরবারি বের করে এগিয়ে আসে। বাধা পেয়ে সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। প্রচণ্ড আঘাতে হাত থেকে ছিট্‌কে পড়ে তরবারি। নিরস্ত্র আগন্তুক ছিটকে পড়ল শক্ত মাটিতে। আর ঠিক তখনই দূরে যোতবিহারের সীমানা অতিক্রম করে একরাশ মশালের আলো এগিয়ে আসতে দেখা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথের ইঙ্গিতে স্তূপীকৃত শুষ্ক পত্রে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। নিরন্ধ্র অন্ধকারে জেগে ওঠে লেলিহান অগ্নিশিখা। চেয়ে দেখেন রঘুনাথ প্রান্তরের উত্তর দিগন্তে জ্বলে উঠলো অনুরূপ এক অগ্নিশিখা। মৃদু হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাঁর ওষ্ঠ। অশ্বারূঢ় বাহিনী নিয়ে পথরোধ করে মূর্তিমান মৃত্যুর মত অকম্প স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন রঘুনাথ; তাঁর ঠিক পাশে অগ্রপশ্চাতে আরও চারশত অশ্বারোহী। এছাড়া দক্ষিণে ও বামে ধনুকে জ্যা সংযোজন করে বাম তর্জনী ও মধ্যমায় তীক্ষ্ণ তীর নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল তিনশত ধানুকী।

আসছে। দিগ্‌বলয়ে দূর নিহারিকার মত মশাল ছুটে আসছে, দেখা যায় কিন্তু ধ্বনি শ্রুত হয় না।

চিৎকার করে ওঠেন ভাস্কর ও সমস্বরে আরও কয়েকজন।

—মহারাজ ঐ আগুনের সংকেত।

মুহূর্তে সহস্র অশ্বের ক্ষুরধ্বনি মুখরিত করে অন্ধকার প্রান্তর। কিন্তু মশাল জ্বলে না। ছুটন্ত রণাশ্বের পৃষ্ঠে থেকে দেখতে পান রাজা নৃসিংহদেব, আগন্তুক ধাবমান মশালের আলো দিগ্‌বলয়ে প্রতিভাত হচ্ছে। দেখতে দেখতে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে অগ্নিশিখা। হঠাৎ দেখতে পান মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য মশাল দপ করে জ্বলে উঠলো। আগন্তুক মশাল শ্রেণীর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে নবোপ্রজ্বালিত মশাল শ্রেণী।

দুই বিপরীতমুখী ঢেউএর সংঘাতের মত ঘোড়াবিহারের বিদ্রোহী সৈনিকদের সঙ্গে রঘুনাথের সৈনিকদের সংঘাত শুরু হল। আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলো ঘোড়াবিহারের বিদ্রোহী সামন্তরাজ প্রতাপনারায়ণ। পথিমধ্যে সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে কে তার গতিরোধ করল?

অসির ঝঞ্ঝনা, অশ্বের হ্রেষা আর আহতের চিৎকারে বিষাক্ত হয়ে উঠলো সেই বিশাল প্রান্তরের ধূলি। ঘোড়াবিহারের বিদ্রোহী সৈন্যগণ বিপুল বিক্রমে বাধা অতিক্রম করতে বদ্ধপরিকর। ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে থেকেই ভাস্কর একটি মশাল জ্বালিয়ে নিয়েছিলেন নিশানী আলোক থেকে। সেই মশালের স্পর্শে একে একে ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠেই জ্বলে জ্বলে উঠলো মশাল শ্রেণী। দেখতে দেখতে অশ্ব ছুটিয়ে রাজা নৃসিংহদেবের সৈন্যবাহিনী রঘুনাথের সঙ্গে যুক্ত হল।

জমাট অন্ধকারে মশালের আলো ভারী হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্রোহী প্রতাপনারায়ণের সামনে এসে পড়ল যমদূতের মতো নৃসিংহদেবের সৈন্যবাহিনী।

রঘুনাথের অগ্রবর্তী বাহিনী বিপুল তেজে যেন মহাপ্রলয় নামিয়ে আনলো। প্রমাদ গণলো প্রতাপনারায়ণ। তার স্নায়ুতে তীব্র উত্তেজনা তরঙ্গিত হতে থাকে।

মাথার ভিতর আছড়ে পড়ে রক্তের উচ্ছ্বাস। সৈন্যদের আর্তনাদ শুনতে পায় প্রতাপনারায়ণ।

হুঙ্কারে ; আর্তনাদে জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো নির্জন প্রান্তর।

প্রতাপনারায়ণ পিছু হঠছে—

তীব্রবেগে সৈন্য বেষ্টনী ভেদ করে ছুটে এলো রঘুনাথের রণাশ্ব। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে মুহূর্তে লাফিয়ে নেমে প্রতাপনারায়ণের বুকের উপর তরবারি স্পর্শ করলেন রঘুনাথ। তীব্র উত্তেজনায় তাঁর হাত পায়ের পেশীগুলো মশালের আলোয় চিক্‌চিক্‌ করে উঠলো।

—সাবধান বিশ্বাসঘাতক।

রঘুনাথের গলার স্বর প্রান্তরে রণকোলাহল ভেদ করে গর্জন করে উঠলো। নিরুপায় প্রতাপনারায়ণ স্থির। অদূরে যোতবিহারী সৈন্যগণ প্রদ্যুম্নপুরের সৈন্য-বেষ্টিত টুকরো-টুকরো কাল ছায়ার মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। দাউ দাউ মশালের আলোয় ধক্‌ ধক্‌ করছিল তাদের দেহ।

ধীরে ধীরে রাজা নৃসিংহদেবের অশ্বারূঢ় বীরমূর্তি প্রতাপনারায়ণের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। শ্লেষাত্মক হাসির রেখা ফুটে ওঠে রাজার মুখে। রাজার অনুগামী সহযাত্রী যোদ্ধাগণ চক্রাকারে প্রতাপনারায়ণের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল।

—ধন্য রঘুনাথ। রাজকণ্ঠে—কৃতজ্ঞতার সুর স্নেহে রূপান্তরিত হয়। বন্দী প্রতাপনারায়ণের বর্মচর্ম শিরস্ত্রাণ ও তরবারি রঘুনাথ রাজা নৃসিংহদেবের হাতে দিলেন।

রাত্রির অন্ধকার তরলিত হয়ে আসছে। যেন অভিশপ্ত বিস্মৃতির দীর্ঘ অবরোধ ভেদ করে ক্ষীণ মহাজাগতিক রশ্মিধারা স্পর্শিত হচ্ছে পূর্বদিগ্‌বলয়ে।

রাজার অশ্বারোহী সৈন্যগণের হস্তধৃত হর্ষোদ্দীপ্ত মশালশ্রেণী সেই তরলিত অন্ধকারে জলন্ত ধূমকেতুর মত রাজধানীর দিকে ছুটে চলে।

সে রাত্রে প্রদ্যুম্নপুর রাজপ্রাসাদে জেগে ছিলেন রাণী সনকা। পাষাণী মূর্তির মত অবিচল ও অবিকার দুটি চক্ষুর শান্ত কঠোর দৃষ্টি সংকল্পে দৃঢ়। প্রাসাদ শীর্ষে কন্যা চন্দ্রকুমারী ও প্রমদা নিঃশব্দে অপলক নেত্রে দিগন্তের দিকে চেয়ে আছে নিটোল প্রহরায়।

রাত্রি হয়ে এলে রাণী একবার নিজভবনের দ্বারে এসে দেখলেন প্রতিহারীগণ সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। দৃঢ়াঙ্গী যুবতীগণ বাম হাতে চর্ম ও দক্ষিণ হাতে মুক্ত তরবারি নিয়ে অন্তঃপুর প্রহরা দিচ্ছে। রাণীকে দেখে মহামন্ত্রী নিয়োজিত একজন বার্তাবাহী দূত ছুটে এলো।

—কোন সংবাদ? অভিবাদন করে অপেক্ষা করে দূত।

—না।

দীর্ঘ অলিন্দ অতিক্রম করে চলে আসেন রাণী।

ঠিক সেই সময়ে। দুর্গফটক থেকে যাম ঘোষণা করে ঘণ্টাধ্বনি বাজে। প্রাসাদশীর্ষ হতে ছুটে আসে কুমারী চন্দ্র। দেখতে পেয়েছে রাজকুমারী। দূরে দিগ্‌বলয়ে প্রজ্বালিত মশালশ্রেণী দেখতে পেয়েছে প্রমদাও। দ্রুত স্তম্ভ শোভিত দ্বারের সম্মুখে আবার এসে দাঁড়ালেন রাণী সনকা। ছুটে আসে আজ্ঞাবাহী দূত।

—মহামন্ত্রীকে সংবাদ দাও। মশালগুচ্ছ ধেয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাত্রির স্তব্ধতা চূর্ণ ক'রে দুর্গফটকে রণদুন্দুভির নিনাদ স্পন্দিত হতে থাকে।

যুদ্ধ!

শত্রু আক্রমণ।

দুন্দুভি শুনে শয্যায় উঠে বসে নগরবাসী।

নিজ ভবনে দুন্দুভির শব্দ শুনতে পায় সেনাপতি কংসারী। দুন্দুভির ধ্বনি যেন এক সংগীত মন্ত্রের মত আশীর্বাণীর ধ্বনি, কংসারীর অন্তরে হর্ষের কল্লোল জাগিয়ে তোলে।

বর্ম-চর্মে প্রস্তুত হয়ে রাজদুর্গফটকের সামনে এসে দাঁড়ায় সেনাপতি কংসারী। তার আজ্ঞাবহ সৈনিকগণ ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে। দুর্গ মধ্যে মুষ্টিমেয় রাজসৈন্য।

হর্ষোদ্দীপ্ত কংসারী অপেক্ষা করে।

অপেক্ষা।

অপেক্ষা করে রাজকুমারী চন্দ্র।

অপেক্ষা করেন রাণী সনকা।

রাজপুরীতে উত্তেজিত ছুটোছুটি ও দুন্দুভির ধ্বনির মাঝখানে ক্রমে কংসারীর বক্ষ পঞ্জরের উপর দিয়ে স্বর্ণশকট চালিয়ে নবোষার আলোক গগনকপোল রঞ্জিত করে।

প্রদ্যুম্নপুর রাজধানী নতুন করে সেজে উঠলো যৌবন-জৌলুসে। ইতিমধ্যে সংবাদ প্রচারিত হয়ে গিয়েছে সারা প্রদ্যুম্নপুরে। বেজে উঠলো তুরী ভেরী কাড়া নাকড়া। দুর্গফটকে সানাইএ মোহিনীর সুর বাজছে। দলে দলে নগরবাসী সমবেত হচ্ছে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে, দুর্গফটকের বাইরে প্রশস্ত চাতালে। রাতের অন্ধকারে বিদ্রোহী প্রতাপনারায়ণের অভিযান ব্যর্থ করে রাজা ফিরে আসছেন রাজধানীতে। মৃগয়াভিযানে গিয়ে কোন যাদুমন্ত্রে রাজা সসৈন্যে পেঁছে গেলেন

যোতীবিহারের প্রান্তরে, সে কাহিনী মুখে মুখে ফেরে আবাল বৃদ্ধ বণিতার। সকলের হৃদয়ে অঙ্কিত হয় এক বীরমূর্তি। 'রঘুনাথ !!'

রাজপ্রাসাদের মুক্ত বাতায়নে কৌতূহলের উপাসনা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আর একজন। রাত্রি জাগরণে কৃশাজ্যোতিলেখার মত সেই তাপসিকার মুখ, অযত্নবদ্ধ চিকুরদামের স্তবক পিঠে ছড়িয়ে অচঞ্চল দাঁড়িয়েছিল রাজকুমারী চন্দ্র।

দুর্গফটকে তীরবেগে ছুটে আসে অগ্রদূত।

দ্বিগুণ তেজে বেজে ওঠে ভেরী। রাজাগমন সূচিত হয়। ধমনীর প্রতি শোণিত কণিকা উৎসুক হয়ে ওঠে। বাতায়ন থেকে দেখতে পায় চন্দ্রকুমারী, অশ্বারূঢ় এক বাঞ্ছিত বীরমূর্তি ধাবমান সৈন্যঘটার সম্মুখে অগ্রনায়ক। পশ্চাতে বন্দী শৃঙ্খলিত প্রতাপনারায়ণ। তারও আগে পিতা নৃসিংহদেব রথারূঢ় হয়ে উন্নত মস্তকে দুর্গফটক অতিক্রম করলেন।

দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত করে জয়ধ্বনি উত্থিত হয়।

—জয় মহারাজ নৃসিংহদেবের জয়।

—জয় রঘুনাথের জয়।

'রঘুনাথ !' বাতায়নে দাঁড়িয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে চন্দ্রকুমারীর কম্পিত অধরে অস্ফুটস্বরে ধ্বনিত হয়।

"—তুমি প্রেম, তুমি আনন্দ, তুমি তৃপ্তি।"

দেরী করলেন না প্রদ্যুম্নপুরাধিপতি মহারাজ নৃসিংহদেব। সেই মুহূর্তেই বিচারসভা বসল। মহামন্ত্রী, একান্ত সচীব ভাস্কর, সেনাপতি কংসারী ও অন্যান্য অমাত্যগণ সভাকক্ষে স্থির হয়ে অপেক্ষা করে। অন্তঃপুরে গবাক্ষপথেও উৎসুক নয়ন পেতে পুরনারীগণ অপেক্ষারতা।

—'মৃত্যুদণ্ড।' বিদ্রোহীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হল। আর সেই সঙ্গে বীর্যবত্তার পুরস্কার স্বরূপ যোতীবিহারের সিংহাসন প্রদত্ত হল বীর রঘুনাথকে।

রাজার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হতে থাকে দেওয়ালে দেওয়ালে। অলিন্দে অলিন্দে।

—জয় রাজাধিরাজ নৃসিংহদেবের জয়।

—জয় সামন্তরাজ রঘুনাথের জয়।

সমবেত কণ্ঠ নিঃসৃত জয়ধ্বনি। ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল প্রাণে প্রাণে।

অন্তঃপুরে গবাক্ষ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল কুমারী চন্দ্র।

উৎফুল্লামেরু-মরালীর মত অলিন্দ পার হয়ে ছুটে এলো চন্দ্রকুমারী।

—প্রমদা, সখী প্রমদা !

—বলো।

—এদিকে এসো।

প্রাসাদের একটি কক্ষের একটি কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে দু'হাতে মালার মত নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে প্রমদার মুখটা নামিয়ে আনে নিজের মুখের কাছে রাজকুমারী চন্দ্র।

—একদিন তুই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলি না, কি তার পরিচয়?

—করেছিলাম।

—শোন্।

—বল।

—তার নাম রঘুনাথ, যোতবিহারের রা-জা।

নিবিড় আলিঙ্গনে প্রমদার বুকের মধ্যে মোমের মত গলে পড়ে নৃসিংহদুহিতা অনূঢ়া চন্দ্রকুমারী।

এখন অনেক রাত।

যোতবিহারে নিজের গৃহের একটি নিভৃত কক্ষের মধ্যে গণপতি সিংহ চিন্তিত মনে বসে ছিল।

বাইরে চৈত্রের কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রির আকাশ নিথর। দূরে যোতবিহারের রাজপ্রাসাদ নীরব। অচেতন। আলো জ্বলেনি প্রধান ফটকে। মনে মনে ভাবছিল গণপতি সিংহ। কাল প্রত্যূষে নবসাজে সজ্জিত হয়ে যোতবিহার বরণ করে নেবে তাদের নতুন রাজাকে। আজ কয়েকদিন ধরেই তার প্রস্তুতি চলছে। ঘোষিত হয়েছে রাজা নৃসিংহদেবের সিদ্ধান্ত। কোন বিরূপ গুঞ্জন, মৃদুতম কোন মর্মরও শোনা যায় নি, বরং অত্যাচারী প্রতাপনারায়ণের মৃত্যুদণ্ডে পুলকিত হয়েছে জনপদবাসী। সূর্যালোকিত এক স্বপ্নের দিকে ধাবিত হচ্ছে তাদের মন। নতুন রাজাকে বরণ করে নেবার জন্য চঞ্চলিত রাজ্যবাসী।

ঝিমঝিম রাত। পিলসুজের উপর জলন্ত প্রদীপের ম্লান আলোকশিখার দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে গণপতি। কে সেই বিশ্বাস হন্তারক? যে পূর্বাহ্নেই সমস্ত পরিকল্পনা রাজা নৃসিংহদেবের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে?

বুকের মধ্যে শত বৃশ্চিক দংশনের মত হঠাৎ এক শঙ্কা জ্বলে ওঠে গণপতির। ধবক্ করে তার হৃদ্‌পিণ্ড জ্বলে ওঠে এক অনিশ্চিত আশঙ্কায়।

কেউ জানে? কেউ জানে কি গণপতির এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার কাহিনী? দুই চক্ষু মুদ্রিত করে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে গণপতি সিংহ।

অন্ধকারে তার সকল জিজ্ঞাসার উন্মোচন করে তার মানসলোকে ভেসে ওঠে একটি মুখ, সে মুখ সেনাপতি কংসারীর।

ঠিক সেই সময়ে সর্বাঙ্গে কালো বস্ত্র জড়িয়ে এক অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব ছুটিয়ে যোতবিহারের দিকে ধেয়ে আসছিল। আকাশ অন্ধকার। আবছা অন্ধকারে দূরে যোতবিহারের স্তব্ধ রাজপ্রাসাদ দেখা যায়। অশ্বের গতি সংযত করে অশ্বারোহী। দীর্ঘ পথ একটানা অশ্ব চালনায় তার ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমে উঠেছে। কৃষ্ণ বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে অশ্বারোহী স্বেদবিন্দু মুছে নিল। নিকটে ধ্বক্ ধ্বক্ জোনাকির চকমকি জ্বলা ঝুলকালি এক অশ্বত্থ তলে রেকাবে পা দিয়ে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করে অশ্বারোহী। সেখান থেকে সন্ধানী চোখ মেলে অন্ধকারে গণপতির বাসভবনটি ঠিক করে নিল নিশাচর আগন্তুক। কৃষ্ণপক্ষের কৃষ্ণ রাত্রির আকাশে হঠাৎ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দুই একটি তারা মিটি মিটি জ্বলে উঠলো। ঝোপে ঝাড়ে জ্বলে জোনাকির বাতি। গণপতির বাসভবনের সম্মুখে এসে থমকে দাঁড়ালো আগন্তুক, নির্জন দালানে আলো নিভে গিয়েছে। শোক-বিষাদের থমথমে আবহাওয়ায় মৃতকল্প গণপতির গৃহে মার্জারের মত সন্তর্পণী পা ফেলে অলিন্দে উঠে এলো কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত আগন্তুক।

নিস্তব্ধ নীরব রাত্রি। তারাগুলো আবার ঢেকে গেল মেঘে মেঘে। ঈষৎ উন্মুক্ত দ্বারপথে ক্ষীণ আলোর আভাস। ধীরে, অতি ধীরে দ্বার ঠেলে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে আগন্তুক। নিজের চিন্তায় নিমগ্ন ছিল গণপতি।

দ্বার ঠেলে একটি দীর্ঘ মনুষ্যমূর্তি যে ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করছে তা অনুভব করে না গণপতি। পশ্চাৎ দিক থেকে দ্বি-ধার তীক্ষ্ণ ছোরাটা সমস্ত শক্তি হাতের কব্জীতে এনে ছুড়ে দিল আগন্তুক।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ শব্দ। পিঠের দিকে হাত দিতেই অসহ্য যন্ত্রণায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো গণপতি। সুতোর মত ক্ষীণ রক্তধারা গড়িয়ে পড়ছে। দ্বি-ধার তীক্ষ্ণ ছোরাটা আমূল বসে গিয়েছে গণপতির পিঠে। নিখুঁত হাতের সাফাই কাজ।

একটি মুহূর্ত। হাতের মুষ্ঠি শিথিল হয়ে আসে গণপতি সিংহের। শেষ জীবনীশক্তিটুকু সংগৃহীত করে ফিরে দাঁড়ালো গণপতি। মুখ থুবড়ে পড়বার আগের মুহূর্তে গণপতির ঘোলা চোখ কৃষ্ণবস্ত্রের আবরণের মধ্য থেকে জ্বলন্ত চোখ দুটি দেখে কংসারীর মুখটা আবিষ্কার করতে পারল। পর-মুহূর্তেই মৃত্যুর বীভৎস মসি মুখে মেখে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল গণপতি। একলা ঘরে, মেঝের উপর।

রাতের অন্ধকার জমাট বেঁধে আসে।

কংসারীর অশ্ব যখন রাত্রির তৃতীয় যামে প্রদ্যুম্নপুরে পৌঁছাল তখন দুর্গফটকে অতন্দ্র প্রহরীদের পাশ দিয়ে কর্তব্যরত এক মশালচী জ্বলন্ত মশাল হাতে আলোর তদারকী করে ফিরছে।

তরুণ দেবদারুর মত যৌবনাঢ্য মূর্তি রঘুনাথের শির চুম্বন করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন পঞ্চানন ঘোষাল। চমকিত চিত্তের আগ্রহ রোধ করতে গিয়ে তাঁর দুই চোখ বাষ্পাকুল হয়ে উঠলো। রূপাতিশালী পুত্রের রাজাভাবে আনন্দিতচিত্ত পঞ্চানন ঘোষাল মনে মনে প্রার্থনা করেন,—সুন্দর হোক, তোমার যৌবনধন্য জীবনের সকল কামনা চরিতার্থ হোক।

—আমার প্রণাম নিন পিতা।—নতমস্তক হয়ে পঞ্চানন ঘোষালের পদস্পর্শ করে প্রণাম করেন রঘুনাথ।

—সুখী হও।—ভাব বিচলিত সাগ্রহ স্বরে আশীর্বাণী উচ্চারণ করেন পঞ্চানন ঘোষাল।

—আমার একটি অনুরোধ আছে।—নত নয়নে দাঁড়িয়ে থাকেন রঘুনাথ।

—আমার কাছে ?

—হ্যাঁ।

—বল।

—আমি একটি উপহার চাই পিতা।

—তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই রঘুনাথ।

—কথা দিন পিতা। নিষ্পলক নয়নের দৃষ্টি তুলে তাকান রঘুনাথ।

—কি চাও বল।—স্নেহার্দ্র পঞ্চানন ঘোষালের কণ্ঠস্বর।

—যোতবিহারের সিংহাসনে আমার মাথার উপর কোন রাজছত্র থাকবে না পিতা।

—রাজছত্র থাকবে না !—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন পঞ্চানন ঘোষাল।

—না পিতা তার পরিবর্তে······

—তার পরিবর্তে ?—কৌতূহল দমন করতে পারেন না পঞ্চানন ঘোষাল।

—যোতবিহারের নতুন রাজার মাথার উপরে সূর্যের মত সদা-জাগ্রত থাকবে আপনার বিদগ্ধ মন্ত্রণা।

—তুমি ধন্য। তুমি আত্মজ্ঞানী।—আর একবার রঘুনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরেন পঞ্চানন ঘোষাল। তাঁর সুস্মিত নয়নে ও অধরে শান্ত ও কঠিন এক সংকল্পের আনন্দ ফুটে ওঠে। সকল প্রতীক্ষার আনন্দ প্রণয়সান্দ্র স্বরে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। রঘুনাথকে সঙ্গে নিয়ে মাতৃকুটীরের দিকে এগিয়ে গেলেন পঞ্চানন ঘোষাল। সেখানে ইতিমধ্যে রঘুনাথের অনুগামীগণ পত্রপুষ্পে মাতৃকুটীর সজ্জিত

করে। কাংসাধারে সৌরভতরু পুড়িয়ে সুরভিত করে তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছিল।

মাতৃকুটীরে প্রবেশ ক'রে মাতৃঘটে প্রণাম করে বাইরে বেরিয়ে এলেন রঘুনাথ। তাঁর বিবচ আননশোভা বাষ্পাকুল হয়ে রয়েছে মাতৃস্মৃতি রোমন্থন ক'রে। এগিয়ে এসে স্মরণ করিয়ে দেবার ভঙ্গীতে বলে অঙ্গদ।

—সময় বেশী নেই রাজা। প্রদ্যুম্নপুরাধিপতি নৃসিংহদেব শোভাযাত্রা সহকারে যোতবিহার অভিমুখে রওনা হয়ে গিয়েছেন অনেকক্ষণ।

—হ্যাঁ চল।—ঈষৎ হাস্যে অধর স্ফুরিত হয় রঘুনাথের।

সকলেই অশ্বারূঢ় হয়।

অশ্বারূঢ় হন রঘুনাথ।

অপেক্ষমান জনতার উল্লাস শান্ত মাতৃকুটীরের নীরবতা মথিত করে।

—জয় রাজা রঘুনাথের জয়।

সৌরভে পরিকীর্ণ গ্রামস্থলী উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

যোতবিহারের রাজপ্রাসাদের সম্মুখে রথ থেকে সমবেত প্রজাপুঞ্জের মাঝখান দিয়ে দরবারের দিকে হেঁটে গেলেন রাজা নৃসিংহদেব। সমবেত দর্শকগণ বিপুল উৎসাহে পুষ্পবৃষ্টি করছিল তাঁর মাথার উপর।

দরবারে ঢুকলেন রাজা নৃসিংহদেব। পঞ্চপ্রদীপের আলোয়, অগুরুবর্তিকার ধোঁয়ায় ভরে উঠেছে দরবার কক্ষ মনোমুগ্ধকর সৌরভে। জ্যোতির্ময় একটি শান্ত মধুর অনুভূতির স্পর্শ সঞ্জীবিত করে তোলে তাঁর সকল অন্তর। ধীরে ধীরে তিনি সিংহাসনে গিয়ে বসলেন। অন্যান্য রাজকর্মচারীগণ, প্রবীণ অমাত্য ও যোতবিহারের সম্ভ্রান্ত নগরবাসী যে যার উপযুক্ত আসনে উপবেশন করলেন। রাজা নৃসিংহদেবের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হল সভাতল।

ঘোষণা করলেন রাজা নৃসিংহদেব।

—সত্য প্রেম ধর্মকে যে চরম লাঞ্ছিত করেছে সেই প্রতাপনারায়ণকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে যোতবিহারের সিংহাসনে আমি এক সুযোগ্য যুবককে বসাতে চাই। তার নাম রঘুনাথ।

সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনিতে মুখরিত হল দরবার কক্ষ।

—জয় মহারাজা নৃসিংহদেবের জয়।

—জয় রাজা রঘুনাথের জয়।

ঠিক সেই মুহূর্তে বহির্দ্বারে সমবেত জনতার হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে পুষ্পাঘাত দুই যৌবনান্বিত হাতের বাধায় সহ্য করতে করতে রঘুনাথ দরবারে প্রবেশ করলেন। কক্ষ মুখরিত হল। এগিয়ে গিয়ে রাজাকে অভিবাদন করলেন রঘুনাথ।

—আপনার ইচ্ছাকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার ক'রে নিলাম পিতা।

"পিতা!"

অপুত্রক রাজা নৃসিংহদেব বক্ষের গভীর হ'তে উৎসারিত এক তৃপ্তির মর্মর-রোল শুনতে পান। স্ফুট কুসুমের নবপরাগের মত এক সুরভিত মোহ ক্ষণকালের জন্য তার সকল ভাবনাকে অবশ করে দেয়।

সভাতলে জয়ধ্বনি প্রকম্পিত হয়।

—জয় রাজা রঘুনাথের জয়।

এই সময় দ্রুতগতিতে একজন রাজকর্মচারীকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। অসম্ভব উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে। উত্তেজিতভাব বজায় রেখেই অভিবাদন করে সংবাদ পরিবেশন করে।

—রাজসেনানায়ক গণপতির মৃত্যু হয়েছে রাজা।

সংবাদ দীর্ঘ নয়। চকিতে সভাস্থ সকলের মুখের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করেন রঘুনাথ। না কোন বজ্রাহত প্রতিক্রিয়া কারো মুখে নেই।

তবু—

সচেতনতার ভঙ্গীতে রঘুনাথ বললেন।

—তুমি এ সংবাদ কি ভাবে পেলে?

—আমি তাঁর রক্তাপ্লুত মৃতদেহ স্বচক্ষে দেখে এসেছি রাজা।

—রক্তাপ্লুত দেহ?

—নৃশংসভাবে তাঁকে হত্যা করে মৃতদেহ তার ঘরেই ফেলে রেখে গিয়েছে রাজা।

—কে করেছে এই কাজ?

তিনি চিৎকার করে উঠলেন।

—আমি জানতে চাই, কে করেছে এই কাজ?

—এ কাজ নিশ্চয়ই কোন বিদ্রোহীর রাজা।

—যারা প্রদ্যুম্নপুরের সিংহাসন অধিকারের ষড়যন্ত্র করেছিলেন?

ক্ষণকাল মাত্র স্তব্ধতা বিরাজ করে সভাগৃহে।

—আমি জানি।—স্তব্ধতা ভঙ্গ করেন রঘুনাথ।

—আমি জানি। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজন ছিল ঐ গণপতি সিংহ। তার কণ্ঠ চিরকালের মত রুদ্ধ করে দিয়ে নিজেকে আড়াল করতে চাইছে অপর কেউ।

—সন্দেহ অমূলক নয়।—রঘুনাথের বক্তব্য সমর্থন করেন রাজা নৃসিংহদেব।

এক মুহূর্তও কালক্ষেপ করলেন না রঘুনাথ। সভাকক্ষে দৃষ্টি সঞ্চালন করে নিকটেই দণ্ডায়মান পার্শ্বচর অঙ্গদের উপর দৃষ্টি স্থির করে বললেন।

—একটি বিষয়ে আমার নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার।

সকলেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

—বিশ্বাসঘাতকদের আমি ঘৃণা করি। তোমরা কে কে আমার আনুগত্য মেনে নিচ্ছ?

ক্ষণকাল মাত্র স্তব্ধতা! অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শ্রুত হল।

সকলে কোষ থেকে তরবারি উন্মুক্ত করে রঘুনাথের পদপ্রান্তে রাখল।

—অঙ্গদ।—নিজের কোষ থেকে তরবারি উন্মুক্ত করে এগিয়ে গেলেন তরুণ রাজা রঘুনাথ। এগিয়ে এলো অঙ্গদ। তার হাতে তরবারি প্রদান করে রঘুনাথ ঘোষণা করলেন—

—এ রাজ্যের সৈন্যাপত্যের ভার আমি তোমার উপর অর্পণ করছি।

তরুণ সেনাপতির জয়ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো সভাতল। আভূমি নত হয়ে রাজকীয় মর্যাদায় অভিবাদন করে অঙ্গদ।

—আমি দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে এই তরবারির ও বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করব রাজা।—প্রত্যয়দৃঢ় কণ্ঠস্বর অঙ্গদ রায়ের।

সভা ভঙ্গ হল।

*　　*　　*

কালচক্রে সময় আবর্তিত হয়।

দূরে পশ্চিমের দিগ্‌বলয়ে কুঙ্কুমিত রশ্মিরাশি সন্ধ্যায় পুলকিত বনদ্রুমবাহু স্পর্শ করে বিদায়-চুম্বন অঙ্কন করছে। রাজপ্রাসাদ থেকে কিঞ্চিৎ দূরে কানাই সায়রের তটরেখা বেয়ে সীধুগন্ধ বকুলে আকীর্ণ রাজোদ্যানের দিকে ধীরে ধীরে বিমুগ্ধ পদ সঞ্চারে এগিয়ে যাচ্ছিল প্রমদা। অলিচুম্বিত অতসী কুঞ্জ শিহরিত করে, প্রেঙ্খাকুঞ্জ অতিক্রম করে মাধবী লতিকায় মুণ্ডিত অতিথিবাটিকায় এসে দাঁড়ায় প্রমদা।

—আমি এসেছি ভাস্কর!

আয়তাক্ষ ভাস্করের কম্প্র দৃষ্টি পিপাসাতুর হয়ে ওঠে। প্রস্ফুট কুসুমকোরকের দিকে আসবলুব্ধ মধুপের মত প্রমদায় পীনোন্নত বক্ষ, চন্দন চর্চিত চিবুক ও রক্ত প্রবালের মত অধরের দিকে ভাস্করের দুই চক্ষুর দৃষ্টি ছুটে যায়। অতিথি-বাটিকার নিভৃতে চঞ্চল হয়ে ওঠেন ভাস্কর সিংহ।

—এসো প্রিয়া।—মধুরাধরা নারীর একটি চুম্বনে চঞ্চলিত হবার জন্য উৎসুক হয় ভাস্করের আলিঙ্গনোন্মুখ দুই বাহু।

—প্রিয়তম।—ঝঞ্ঝাহত কাননের উৎক্ষিপ্ত পুষ্পের মত ভাস্করের বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে তরুণী প্রমদা। শিহরিত হয় বনবায়ু। অপরাহ্ন আলোকে আলিম্পিত অতিথিবাটিকা তরলিত রক্তাভার প্রবাহে শোণিম। মেঘচিকুরা

প্রমদার মুখের দিকে মমতামথিত স্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন ভাস্কর সিংহ।

—অমন করে দেখো না।—নবপরিণয়লজ্জাবিধুরা বাসকশয়নভীরু বধুর মত আরক্তিম হয়ে ওঠে প্রমদার সুচারু কপোল।

—প্রিয়া প্রমদা।—মধুরসান্দ্র প্রণয়ার্দ্র স্বরে আহ্বান করে ভাস্কর।

—কেন জানি না তোমাকে কাছে পেলে আমার তৃষ্ণা তৃষ্ণান্বিত হয়।—প্রমদার কণ্ঠে আসক্তি বাজে।

—কেন জানি না তোমাকে কাছে পেলে আমার বাসনার বহ্নি জ্বলে। খর-কামনা স্বীকার করেন ভাস্কর সিংহ।

—তুমি মদবিলোলিত উৎসব, তোমার নিশ্বাসের ঝঞ্ঝা আমাকে দাও। প্রমদার ধমনীতে উচ্ছ্বসিত অনুরাগের শোণিমা। স্বচ্ছ অংশুক বসনে আবরিত প্রমদার অঙ্গশোভা চমকিত হয়। উন্মোচিত সেই দাহিকার উপঢৌকনের উদ্ভিন্ন ঐশ্বর্যের উদ্‌গত অলিন্দে ওষ্ঠ স্পর্শ করেন ভাস্কর। শ্বাসবায়ুর উত্তাপ স্পর্শ করে প্রমদার প্রতিটি রোমকূপ। যৌবনরাগে শোণীকৃত হয় অর্ধস্ফুট অধর। দুর্বলা লতিকার মত যৌবন ঝঞ্ঝায় ভাস্করের বুকের নীচে পণ্যায়িতা হতে চায় প্রমদার যৌবনের দ্যুতি।

—আরও, আরও লুব্ধ হও ভাস্কর, প্রতিদানে সম্মানিত কর কুমারীর অনুরাগ।

ভাস্করের হৃদয়ের নিবেদিত শ্রদ্ধানুরাগের লাজাঞ্জলী রাজোদ্যানের মাধবী লতায় মুণ্ডিত অতিথিবাটিকার পুষ্পাসনে প্রিয়া প্রমদার শ্বেত-চন্দনসিক্ত দেহের উপর লুটিয়ে পড়ে।

প্রমদার প্রভাময় অধরের কৌমুদী কণিকা ফুটে ওঠে।

অন্তরের গভীরে শোণিতের কলরোলে এক প্রজায়িণী মহিমার সঙ্গীত বাজে। দুই চক্ষুর কোণে মুক্তাফলের মত মধুর ও উজ্জ্বল অশ্রুবিন্দু ফুটে ওঠে।

অতিথি বাটিকায় নিবিড়তর হয় সন্ধ্যা। উদ্যানের পুষ্পরাজির সৌগন্ধ বাতাসে ছুটোছুটি করে।

সেই সন্ধ্যায়।

মুহূর্তের অভাবনীয় বিপর্যয় শান্ত চিত্তে মেনে নিয়ে ক্লান্ত দেহে নিজের অশ্বকে সংহত করে ধীরে রাজপুরোহিত অর্কদেবের গৃহের সম্মুখে অবতরণ করলো রাজসেনাপতি কংসারী।

রাজপুরোহিত অর্কদেব বহিঃবাটীতে কংসারীর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। আজই প্রত্যুষে মন্দিরের পূজাদি সম্পন্ন করে রাজাকে পুষ্পাঞ্জলী সহকারে আশীর্বাদ

করে ফিরবার সময় সেনাপতি কংসারীর সঙ্গে আলোচনান্তে তাঁর গৃহে আমন্ত্রিত হয়েছে কংসারী।

আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করুন দেব।—নত হয়ে ভক্তি গদগদ চিত্তে প্রধান পুরোহিত অর্কদেবের চরণ স্পর্শ করে কংসারী।

—শুভমস্তু।—ইঙ্গিতে আসন গ্রহণ করতে আহ্বান করেন অর্কদেব।

বিগত কয়েক পক্ষ ধরে চিন্তা করার পর আলোর সন্ধান পেয়েছে কংসারী। মাত্র একটি লোকের সাহায্য নিতে হবে। প্রধান পুরোহিত অর্কদেবকে যে কোন মূল্যে ক্রয় করতে হবে। তবুও মনের কন্দরে পরিকল্পনা গড়ে তোলা এবং তা বাস্তবে রূপায়িত করা এক কথা নয় একথা উপলব্ধি করেই সেনাপতি কংসারী পরিকল্পনা সম্পন্ন করতে নিজেই অগ্রসর হয়েছে। মনে মনে আর একবার চিন্তা করে দেখলো কংসারী রাজার প্রতি এ রাজ্যের সাধারণ প্রজা এবং কিছু শক্তিশালী অমাত্য শ্রদ্ধায় প্রেমে ও স্নেহে আপ্লুত হয়ে রয়েছে। কাজেই প্রধান পুরোহিতকে একসূত্রে গেঁথে স্বপক্ষে নিয়ে আসার চিন্তা বাতুলতা জেনেই অন্যপথ ধরে সন্তর্পণে এগুতে চায় সেনাপতি কংসারী। বিনয় নম্র কণ্ঠে প্রধান পুরোহিত অর্কদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে কংসারী বলে।

—একটি অসাধারণ স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিতে আপনার কাছে এসেছি আর্য।

—স্বপ্ন?—কৌতূহলি হন প্রধান পুরোহিত অর্কদেব।

—হ্যাঁ,—এক শান্ত স্বপ্নচ্ছবি যেন ফুটে উঠতে চায় কংসারীর কুটিল দুই চোখে। কয়েকটি মুহূর্ত শুধু স্তব্ধ হয়ে থাকেন অর্কদেব। তারপর বলেন।

—কি সে স্বপ্ন? যার জন্য এত বিচলিত হয়েছ?

—আমি এক জাগ্রত দেবতা মন্দিরে আপনাকে পূজারত দেখেছি আর্য।

—আমাকে?—সুপ্তির মাঝখানে হঠাৎ যেন জাগরিত হন আর্য অর্কদেব।

—হ্যাঁ দেব।—শীত ভীরু মল্লিকার মত যেন রোমাঞ্চিত কংসারীর কণ্ঠস্বর।

—শুধু তাই নয় দেব, দেখলাম আপনার মন্ত্রবলে এক দেবী আবির্ভূতা হয়ে এক নবজাত শিশুকে আপনার হাতে তুলে দিলেন। সেই শিশুর ক্রন্দনধ্বনিতে আপনার পূতযজ্ঞোপবিত আলোড়িত হল। দেখলাম আপনি সেই দেবোপম শিশুকে মহারাজা নৃসিংহদেবের ক্রোড়ে অর্পণ করলেন। হঠাৎ এক স্বর্গীয় সুষমায় ভরে গেল চতুর্দিক। কুহেলিকায় আবৃত হল সেই দেবপ্রাঙ্গণ। তারপর এক উদ্ভাসিত আলোকে দেখলাম সেই শিশু প্রদ্যুম্নপুরের রাজসিংহাসনে বসে আছে।—উতলা চৈত্রবায়ুর মত উচ্ছ্বসিত স্বরে আকুল প্রশ্ন করে কংসারী—

—বলুন দেব এই স্বপ্নের কি কোন গূঢ় অর্থ আছে?

কয়েক মুহূর্ত শুধু কি যেন চিন্তা করলেন প্রধান পুরোহিত আর্য অর্কদেব। তার পরেই বললেন।

—কামনা করি তোমার স্বপ্ন সফল হোক।—অচঞ্চল মূর্তি অর্কদেবের দুই চক্ষু জ্যোতিধারার সূর্যের ব্রতের মত স্নেহাস্পদ রাজা নৃসিংহদেবের উত্তরাধিকারী অনাগত এক শিশুর আবির্ভাব কামনায় স্নিগ্ধ হয়।

—দেব!

কংসারী উঠে দাঁড়িয়েছে। আভূমি নত হয়ে আর একবার প্রধান পুরোহিত অর্কদেবের পদস্পর্শ করে প্রণাম করে কংসারী। ভাবাকুল কণ্ঠস্বর যেন বেদনাঘাতে বিচলিত হয়।

—রাজার কোন অমঙ্গল সূচিত হবে না তো আর্য?—

কপট ব্যথিত চক্ষু তুলে প্রশ্ন করে কংসারী।

—না, বরং এই স্বপ্ন একটি শুভ ইঙ্গিত বহন করছে রাজসেনাপতি।—প্রধান পুরোহিত আচার্য অর্কদেবের প্রসন্ন মুখাবয়বের দিকে তাকিয়ে অনুভব করে কংসারী, প্রবঞ্চিত ঐ হৃদয়ে এক নূতন মিথ্যা আনন্দ অনুরণিত হচ্ছে।

—তাই যদি হয় তবে এই স্বপ্নের কাহিনী আর কারো কাছে জানিয়ে ফললাভে বাধা সৃষ্টি না করাই শ্রেয় নয় কি আচার্য?

চতুর সাবধানী স্বরে কথা কয়টি বলে উত্তরের অপেক্ষা করে কংসারী।

—যথার্থ বলেছ। আর কাউকে এই গূঢ় স্বপ্নতথ্য প্রকাশ করবে না।—বিশ্বাসদৃঢ় শোনা যায় রাজপুরোহিত আচার্য অর্কদেবের কণ্ঠস্বর।

—যথা আজ্ঞা দেব।

আর একবার অর্কদেবের পদস্পর্শ করে প্রণাম করে আচার্য ভবনের অলিন্দ থেকে নেমে আসে কংসারী। ধীরে অশ্বারূঢ় হয়ে অশ্বচালনা করে পথরেখার উপর এসে অশ্ব ছুটিয়ে দেয়। ভাবতে থাকে কংসারী, অর্কদেবের সকল বিশ্বাস গ্রাস করে যে অভিসন্ধির বীজ বপন করে এলো সে, তা কি মহীরূহে রূপান্তরিত হবে না? অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে কংসারীর দুই বীভৎস চক্ষু।

অশ্ব ছুটে চলে।

ছুটে চলে প্রধান পুরোহিত আচার্য অর্কদেবের আশাতুর মন। বাইরের অন্ধকার থেকে চোখ ফিরিয়ে আপন গৃহমধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করেন অর্কদেব। দীপালোকে আলোকিত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে সমাহিত মূর্তির মত স্তব্ধ ও নিঃশব্দ হয়ে বসে থাকেন অর্কদেব। ধীরে ধীরে চৈত্রের রাত্রি প্রহরান্তরিত হতে থাকে। তৈলহীন দীপের বক্ষ জ্বলে জ্বলে নিভে যায়।

স্তব্ধ সমাহিত অর্কদেবের তন্দ্রাচ্ছন্ন দুই চক্ষু সহসা এক স্বপ্নঘোরে প্রলিপ্ত হয়। যেন দুটি চলোচ্ছল চরণের মঞ্জীরধ্বনি কর্ণে বাজে। বক্ষের স্পন্দনে ও নিঃশ্বাসে এক অদ্ভুত অনুভূতির সঞ্চার জাগে। অন্তরের গম্ভীর মন্দ্রধ্বনি যেন ডাকে—'আয় আয়—, আমাকে নিয়ে রাজার কাছে পৌঁছে দে।'

চমকে ওঠেন আচার্য অর্কদেব। অপসৃত হয় দৃশ্যমান স্বপ্নের শেষ কল্লোল।

সহসা চৈত্র রাত্রির সমীর মর্মর ধ্বনি তোলে।

রাত্রির অন্ধকারে দেওদার গাছে সমাচ্ছন্ন রাজপথ বেয়ে নিজ ভবনের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো কংসারী। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে ভবনের অন্ধকার অলিন্দে পদচারণা করতে থাকে কংসারী। অস্থির পদসঞ্চার বন্ধ করে মাঝে মাঝে নক্ষত্র খচিত কৃষ্ণাকাশের দিকে তাকায় কংসারী। নক্ষত্রের আলো সূচীভেদ্য আন্ধকারকে আলোকিত করতে পারছে না।

রাত্রি গভীর হয়ে চলেছে।

অস্থির হয়ে উঠছে কংসারী, তার দুইজন অনুচর নগর প্রান্তের প্রজাকুটীর থেকে নির্দিষ্ট এক কুমারীদেহ অপহরণ করে আনবার জন্য নগর পরিক্রমায় বেরিয়েছে। এখনো তারা প্রত্যাবর্তন করে নি। অন্ধকার পথরেখার উপর এক কুটিল সংকল্পনিস্পলক চক্ষু তুলে তাকিয়ে থাকে কংসারী।

ওরা আসে।

অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ক্রূরবায়ুবিমর্দিতা ব্রততীর মত অসংবৃতা এক নারীদেহভার বহন করে এনে অলিন্দে কংসারীর সম্মুখে নামিয়ে দেয় অনুচরদ্বয়। স্তব্ধ সেই কুমারীর মুখবন্ধন ও চক্ষু বন্ধন খোলে না কংসারী, মুহূর্তে তার দুই ভুজ-ভুজঙ্গমের আলিঙ্গনে কেঁপে ওঠে কুমারী তনু। পরমুহূর্তেই সেই পুষ্পিতা দেহ বহন করে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে কংসারী। তার অস্থির কামনাতাড়িত বাহু অন্ধকারে সঞ্চালিত হতে থাকে। বাত্যাহত দীপশিখার মত নির্মোখ কুমারী তনুর সকল আবরণ, সকল কৌমার্য কংসারীর কদর্য হাত কলঙ্কিত করে। বীভৎস বিকৃত কামনার বিষ খরবহ্নির মত কুমারীর দেহাভ্যন্তরে প্রজ্বলিত হয়।

জ্ঞান হারায় নিষ্পাপ বিক্ষত একটি পুষ্পকোরক।

ক্লান্ত অবসন্ন নেশাগ্রস্ত পিশাচের মত অলিন্দে ফিরে আসে কংসারী।

অপেক্ষমান অনুচরদ্বয় ছুটে আসে। মনের ভিতর উদ্দীপনার আগুন জ্বলছিল, সেই নির্জন অন্ধকারে কয়েকটি স্বর্ণমোহরের চিন্তা চকচক করছিল। কংসারীর হাত থেকে সেগুলি পেতেই সুখের আমেজে বিভোর হয়ে ওঠে তারা।

—আর দেরী নয়।—

কংসারীর চাপাম্বরে ক্লান্ত।

দ্বারপথে ভিতরে প্রবেশ করে পরমুহূর্তেই—সজ্ঞাহীনা দলিতা-মথিতা সেই নারীদেহ বহন করে আনলো অনুচরদ্বয়। মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তারা বিবেকের দংশন সহ্য করে নিল কিনা বোঝা গেল না।

অন্ধকারের মধ্যে খোলা আকাশের নীচে নেমে গেল অনুচরদ্বয়।

চলে গেল।

আকাশে তখন অসংখ্য অনামিকা তারার ভিড়।

প্রদ্যুম্নপুরাধিপতি মহারাজ নৃসিংহদেব তাঁর প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে পদচারণা করছেন।

এখন ঊষাকাল।

স্নিগ্ধ হয়ে রয়েছে উদ্যানের বায়ু।

মনের দিক থেকে তিনি বর্তমানে অসুস্থ নন। এখন একটি মাত্র চিন্তা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আদরিণী একমাত্র কন্যার বিবাহ। নিবিড় দৃষ্টি তুলে কন্যা চন্দ্রকুমারী যখন তাঁর মুখের দিকে তাকায় নূতন করে আত্মজাকে যেন চিনতে পারেন কর্তব্যনিষ্ঠ পিতা। সুন্দর বিম্বাধরে ও ভ্রূলতায় রচিত মুখচ্ছবি, যৌবনে ললিত অঙ্গ এখন মাতৃত্ব চায়।

ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্তী সমকক্ষ রাজন্যবর্গের সংবাদ সংগ্রহ করে হতাশ হয়েছেন রাজা নৃসিংহদেব। উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পান নি তিনি। একমাত্র পুষ্করণ রাজপরিবারের সংবাদ ব্যতীত পার্শ্ববর্তী সমস্ত রাজ্যের সংবাদ পেয়েছেন তিনি। একবার সামন্ত নৃপতিগণের কথাও ভাবেন রাজা নৃসিংহদেব। মন্দ সমীরণে পদচারণা করতে থাকেন তিনি। নবোদিত সূর্যকিরণের তির্যক আলোকে দেওদার বৃক্ষের সুদীর্ঘ ছায়া পড়েছে প্রাসাদের গায়ে। প্রাসাদে ফিরে চললেন তিনি। তাঁর ছায়াও অনুসরণ করতে লাগল তাঁকে।

প্রাসাদ অলিন্দে পৌঁছে হঠাৎ আচার্য অর্কদেবকে দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলেন রাজা নৃসিংহদেব। এত প্রত্যূষে রাজমন্দিরে পূজা সাঙ্গ না করে কোন প্রয়োজনে রাজসন্নিধানে এসেছেন রাজপুরোহিত আচার্য অর্কদেব। কিন্তু অর্কদেবের উচ্চারিত আশীর্বাণী শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে সবিনয় প্রশ্ন করেন রাজা।

—কি প্রয়োজনে এই প্রত্যূষে এসেছেন দেব?

—বিশ্রামগৃহে চল কথা আছে।—অর্কদেবের অনুরোধ শুনে বিস্মিত হলেন রাজা নৃসিংহদেব। অর্কদেবকে নিয়ে বিশ্রামাগারে এসে প্রবেশ করলেন তিনি।

ইতিমধ্যে কক্ষমধ্যে অগুরুবর্তিকা জ্বালিয়ে পুষ্পাধারে পুষ্পসজ্জা করে গৃহবিন্যাস সমাপ্ত করে গিয়েছে কিঙ্করী। কিঙ্খাবে আবৃত দারুবেদীকায়

অর্কদেবকে বসতে দিয়ে নিজে আর একটির উপর উপবেশন করলেন রাজা নৃসিংহদেব।

—আমি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি রাজা।

রাজপুরোহিত অর্কদেবের মুখমণ্ডলে প্রত্যুষের শান্তি বিচ্ছুরিত হতে থাকে।

—স্বপ্নাদিষ্ট!—রাজার নয়ন দুর্বহ অনুসন্ধিৎসায় চঞ্চল হয়।

—তোমার রাজ্যের উত্তরাধিকারী তোমার অনাগত পুত্রের আবির্ভাবের সঙ্কেত পেয়েছি রাজা।—এক অপার্থিব প্রত্যয়ে মোহমুগ্ধ হয় অর্কদেবের চক্ষু।

—কি বলছেন আচার্য!—মৃদুশ্বাসকম্পিত বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হয় রাজা নৃসিংহদেবের।

—হ্যাঁ রাজা। চম্পাচন্দনব্রত পালন করে জাগ্রত দেবতা জগন্নাথ দেবের মন্দিরে পূজা নিবেদনের উদ্দেশ্যে সপরিবারে শ্রীক্ষেত্র তীর্থযাত্রার আয়োজন কর। ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করেন আচার্য্য অর্কদেব। তাঁর অচঞ্চল স্বচ্ছদৃষ্টি দ্বারপ্রান্তে প্রভাত সূর্যকিরণের রাগরেখার উপর নিবদ্ধ হয়। কি যেন দেখতে পান অর্কদেব। সুন্দর হাস্যে প্রসন্ন হয়ে রয়েছে তাঁর মুখচ্ছবি।

—অনুভব করতে পারছ রাজা?

অর্কদেবের প্রশ্নে রাজা নৃসিংহদেব বিস্মিত হন—কি আচার্য?

—এই প্রাসাদের আঙিনায় ক্রীড়াচঞ্চল এক শিশুর ছুটাছুটি? মোহমদির উজ্জ্বল দৃষ্টি সম্প্রসারিত করে ধীরে ধীরে প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এলেন আচার্য অর্কদেব। তাঁকে অনুসরণ করে দুর্বাস্তীর্ণ চত্বরের উপান্তে এসে দাঁড়ালেন রাজা নৃসিংহদেব। নবারুণের উদয়চ্ছটা নয়ন-হরণ-শোভা ছড়িয়ে দিয়েছে সারা রাজ্য জুড়ে। রাজার পুত্রস্নেহবুভুক্ষিত অন্তরে রোপিত হয় এক নবীন আশা।

রক্তাধরা পূর্ব-দিগ্‌বধূর রূপময় চুম্বনে উদ্ভাসিত রাজার ললাট সেই অনাগত প্রাপ্তির প্রত্যাসায় রূপরম্য হয়ে ওঠে। অর্কদেবের পদস্পর্শ করে প্রণাম করেন রাজা।

—তবে তাই হোক আচার্যদেব। আপনি দিনক্ষণ দেখে দিন।—উদ্দাম এক স্বপ্ন বুকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন রাজা।

—শুভমস্তু। বৈশাখে রাণী সনকা পুত্রার্থে চম্পা-চন্দন ব্রত সমাপন করলে বৈশাখের শেষ সপ্তাহে তীর্থ যাত্রার আয়োজন কর। প্রিয়া সেবিত হয়ে পুত্রলাভ করবে রাজা, এ আমার স্থির বিশ্বাস।

চলে গেলেন রাজপুরোহিত আচার্য অর্কদেব।

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে রাজা নৃসিংহদেবের দুই চক্ষু। সুস্মিত শান্ত দৃষ্টি নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন তিনি।

অন্তঃপুরে গিয়ে রাণী সনকার সঙ্গে দেখা করলেন।

—রাণী সনকা।—রাজার উৎফুল্ল কণ্ঠধ্বনিতে শান্ত হয়ে যায় রাণী সনকার ত্রস্ত হৃদয়ের আর্দ্রতা। তবু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে সনকা।

—এই অসময়ে অন্তঃপুরে কি কারণে এসেছ স্বামী।

—আজ কেন অসময়ে তোমার কাছে এসেছি অনুমান করতে পার রাণী? দ্রুতকণ্ঠে বলেন রাজা নৃসিংহদেব।

—জানি না।

—আমি কয়েকটি কথা তোমায় বলতে চাই।······আমার জীবনের নির্বাসিত সেই কামনার কথা শোনার সময় কি তোমার হবে?

—তোমার নির্বাসিত কামনার কথা আমি জানি।—মৃদু কণ্ঠে বলেন রাণী সনকা।

—জান! জান কি আমার নির্বাসিত কামনা?

—জানি। স্নিগ্ধ শোনা যায় রাণীর কণ্ঠস্বর।

—কি সে কামনা? চঞ্চল হয়ে ওঠেন রাজা।

—পুত্রকামনা।—রাজার তৃষ্ণার্ত চোখের দিকে চোখ তুলে তাকান রাণী সনকা।

রাণীর সুডৌল দক্ষিণ হাতটি আকর্ষণ করলেন রাজা।

—জান যদি। এই অসুখী মানুষটিকে সুখী করতে পার না?

—আমি। বিস্ময়ে ভেঙ্গে পড়ে রাণী সনকা।

—হ্যাঁ, তুমি।

—কিন্তু—

—আমার সব আছে নেই শুধু পুত্র। এ রাজ্যের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী নেই।

হৈমন্তী কুহেলিকার মত মায়াময় ব্যথিত দৃষ্টি তুলে রাজার মুখপানে তাকান রাণী সনকা।

—আমায় কি করতে হবে? অপরাধিনীর মত সঙ্কুচিত হয় রাণীর কণ্ঠস্বর।

—এ কি! তুমি ব্যথিত হচ্ছ কেন রাণী?

অকস্মাৎ অশ্রুধারায় প্লাবিতা হয় রাণী সনকা। বেদনাভিভূতা স্বরে বলে—তুমি কি অন্য কোন নারীকে বিবাহ করতে চাও রাজা?

মূক উন্মাদের মত রাণীকে বাহুবন্ধে আবদ্ধ করলেন রাজা। অক্ষণে শয়নকক্ষে অরচিত শয্যায় রাণীকে নিয়ে উপবেশন করলেন রাজা নৃসিংহদেব।

নয়নে এক সজল হাস্যদ্যুতি স্পন্দিত করে বলেন রাজা নৃসিংহদেব।

—পুত্রহীনের শূন্যতা নিয়ে যদি পৃথিবীর বুকে শেষ নিঃশ্বাস সঁপে দিতে হয় তবুও অন্য কোন নারীকে বিবাহের কথা ভাবতে পারব না সনকা।

—তবে ? রাণীর আহত মনের শ্রান্ত বেদনা তার মনের মধ্যেই নীরবে হেসে ওঠে।

—আচার্য অর্কদেব এক মধুর স্বপ্নাদেশ শুনিয়ে গেলেন সনকা।—রাণীর সুরভিত কুন্তলে দক্ষিণ হাত স্পর্শ করলেন রাজা।

—জানতে ইচ্ছা করে কি সেই স্বপ্নাদেশ।—উৎসুক রাণীর কণ্ঠস্বর।

—চম্পা-চন্দন ব্রত উদ্‌যাপন করে শ্রীক্ষেত্রে পূজো দিতে হবে রাণী। অনাগত পুত্রের জন্য এই স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন আচার্য অর্কদেব।

ফুল্লকুসুমের মত অকস্মাৎ রাণীর দুই চক্ষু এক বিশ্বাসের স্পর্শে উৎসুক হয়ে ওঠে। চঞ্চল নিঃশ্বাস সংবরণ করে এবার নিজেরই পিপাসিত চিত্তের গুঞ্জন যেন শুনতে পায় রাণী সনকা।

—তীর্থযাত্রার আয়োজন কর স্বামী। আমি আন্তরিক নিষ্ঠায় ব্রত পালন করব। কামনা করি অর্কদেবের স্বপ্ন-কল্পনা আমারই তনয়রূপে আবির্ভূত হোক।

বাজার বাহুবন্ধনের মধ্যে রাণী সনকার বরতনুর মধ্যাহ্ন যৌবন স্বপ্নায়িত হয়।

সময় কারো অপেক্ষায় বসে থাকে না। রাজমহিষী চম্পা-চন্দন ব্রত পালন করে কাঞ্চন ও শস্য দান করলেন। রাজা ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব সহস্র প্রার্থীকে গো ভূমি দান করলেন। রাজপরিবারের এই কীর্তিকথা জনপদের চারণের মুখে সঙ্গীতের মত ধ্বনিত হয়।

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা।

যেন সুন্দর এক আসক্তির গর্বে উদ্ধত চন্দ্রমা দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করেছে। সন্ধ্যায় পুলকবিধুর বকুলে বিহগের সান্ধ্য কূজন শোনা যায়।

রাজোদ্যানে একাকী নিবিড় নয়নে কামনার কল্লোল সহ্য করে মৃদুল পদ সঞ্চালন করছিল রাজকুমারী চন্দ্র। যেন কি এক গূঢ় বেদনার বিহ্বল দৃষ্টি তুলে চন্দ্রিমালোকে তরুচ্ছায়ামেদুর পুষ্পকুঞ্জের তৃণাচ্ছিত পথরেখার দিকে তাকিয়ে পুষ্প প্রেঙ্খায় এসে উপবেশন করে রাজকুমারী চন্দ্র।

অনুভব করে চন্দ্রকুমারী, তার দুই চক্ষুর দৃষ্টি মুগ্ধ হয়ে সেই সুন্দর-প্রভের পায়ের কাছে তার অন্তরের তৃষ্ণার বোঝা নামিয়ে দিয়ে মুক্ত হতে চায়।

প্রেঙ্খাকুঞ্জের উপর স্নিগ্ধ রশ্মি সম্পাত করে পৌর্ণমাসী সন্ধ্যার চন্দ্রমা। বৃন্তচ্যুত হয়ে একটি হরিদ্রাভ দেওদার পত্র চন্দ্রকুমারীর ললাট চুম্বন করে নবনীত স্তনভারবাহী গর্বিত বক্ষঃবাসের অলিন্দে নিবদ্ধ হয়।

হঠাৎ চমকে উঠে অকারণ এক সলজ্জ সন্ত্রাসের স্পর্শে শিহরিত হয়ে চন্দ্রকুমারী এক হাতে উদ্ধত বক্ষ চেপে ধরে অন্য হাতের চম্পকাঙ্গুলি দিয়ে

অলজ্জ সেই দেওদার পত্র বের করে নিয়ে আসে। শ্রাবণী দামিনীর মত ক্ষণালোকে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে চন্দ্রকুমারীর যৌবনমদায়িত তনু। কামনা স্পন্দিত সেই প্রিয়দর্শন দুই ওষ্ঠের কথা মনে পড়ে। শুষ্ক দেওদারের পত্রটির ঘ্রাণ নেয় চন্দ্রকুমারী। শিহরিত হস্তের সেই পত্র সুরোভিত হয়েছে বক্ষঃপুটের পত্রলিখা চুম্বন করে শ্বেত চন্দন গন্ধে।

অকস্মাৎ আবারও যেন নিজের মনের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে চন্দ্রকুমারী। হৃদয়ের গভীরে ফুটে রয়েছে রঘুনাথের মুখকমলশোভা। উদ্যানের নিভৃতে প্রেঙ্খাক্রোড়ে অনুরাগের বেদনায় অশ্রুসিক্তা হয়ে ওঠে চন্দ্রকুমারী।

প্রেঙ্খা হতে অবতরণ করে রাজকুমারী চন্দ্র।

উৎসুক নয়নে স্ফুরিত অধরে বিকচযৌবনের শোভা বিস্তার করে ধীরে ধীরে প্রাসাদে ফিরে আসে চন্দ্রকুমারী।

শয়নকক্ষের দ্বারে সখী প্রমদার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। চন্দ্রকুমারীর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি তুলে চমকে ওঠে প্রমদা।

—কি হয়েছে সখী ?

চন্দ্রকুমারী উত্তর দেয় না। দুর্দম ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস রোধ করে চন্দ্রকুমারী। চঞ্চল হয়ে ওঠে প্রমদা।

—শান্ত হও সখী, বল কি হয়েছে ?

চন্দ্রকুমারীর চক্ষু বাষ্পায়িত হয়।—আমার একটি কাজ করে দিবি প্রমদা ?

—কি কাজ ? বিস্মিত হয় প্রমদা।

বাতায়নের মধ্য দিয়ে জ্যোৎস্নালোকিত দূরান্তের দিগ্‌রেখার দিকে তাকিয়ে থাকে চন্দ্রকুমারী। মনের উদ্দাম স্বপ্ন এত সতর্কতা দিয়ে বেঁধে রাখতে পারছে না চন্দ্রকুমারী। করতলের হরিদ্রাভ সেই চ্যুত দেওদারের পত্রটির উপর সুবাসিত কুমকুমের রক্তিম অধরের সুষমা আলিম্পিত করে জরিদার একখণ্ড চিনাংশুক বস্ত্রের মধ্যে স্থাপন করে প্রমদার হাতে দেয় চন্দ্রকুমারী।

—যেমন করে হোক যোতবিহারে রঘুনাথের কাছে পেঁছে দিতে হবে সখী। দুই হাত দিয়ে সাগ্রহে প্রমদার হাত চেপে ধরে চন্দ্রকুমারী।

—তারপর রাজা যদি জানতে চায় কার এই প্রণয়মহোৎসবের উচ্ছ্বাস, তবে কি উত্তর দিতে হবে ? সকৌতুকে বলে প্রমদা।

—বলবে।—থেমে যায় চন্দ্রকুমারী। কল্পনায় সেই কাঙ্ক্ষিত সৌম্যপুরুষের বিস্মিত দুটি সুন্দর চক্ষুর দৃষ্টির কাছ থেকে হঠাৎ নিজেকে সরিয়ে রাখার ইচ্ছা বহন করে প্রেমবিধুরা চন্দ্রকুমারীর মন।

—বলবে,—এই পৃথিবীর কোন মানুষের ঘরের আঙিনায় প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী এক

নারী বাঞ্ছিতের সানুগ্রহ আমন্ত্রণের অপেক্ষায় অপেক্ষারতা ; হে কঞ্জরকান্তি কুমার তাকে প্রণয় দানে ধন্য কর।

—রাজা যদি সেই পূর্ণতোয়া তটিনীর কাছে তৃষিতের তৃষ্ণা নিয়ে আসতে চান, তখন ?

—বলবে সেই নারীর কামনার একমাত্র আনন্দ তিনি। সেই নারীর হৃদয়কুঞ্জের দেহলী প্রান্তে একদিন নিশ্চয়ই তাঁকে ডেকে নেবে সে।

—বেশ তাই হবে আমার কর্তব্য সাধিত হবে, তোমারও অভিলাষব্রত সফল হবে।

অনুভব করে প্রমদা নৃসিংহরাজভবনের কেতকীবাসিত রাজকুমারীর শয়নকক্ষের স্নিগ্ধ দীপালোকে চন্দ্রকুমারীর প্রেমের তপস্যা আহুতির মত সুন্দর নিষ্কলুষ হয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে।

*　　　　*　　　　*

কথা রেখেছে প্রমদা।

বিমুগ্ধ রঘুনাথ। বাতায়নপথে বৈশাখী মেঘ-বিভ্রাজিত আকাশের দিকে তাকিয়ে অনুভব করেন রঘুনাথ, যেন এক প্রেমের দ্যুতিস্পর্শে উচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে তাঁর স্মরণপথের সব আলো-ছায়া। চন্দন সৌরভে বিচলিত সৌগন্ধ কুঙ্কুমরাগান্বিত সেই দেওদার পত্রটির দিকে আবার তাকান রঘুনাথ। প্রশ্ন করেন।

—এই অর্ঘ্য সত্যই কি আমার জন্য ?

—হ্যাঁ, তোমার জন্য।

—তবে তাকে বলো আমার সব আছে, নেই শুধু পরিপূর্ণ শান্তিময় ব্যক্তিগত জীবন। সেই জীবনের আহ্বানে কোন প্রতারণা সহ্য করতে পারব না আমি।

—না বন্ধু ঐ অর্ঘ্যের বার্তায় কোন প্রতারণা নেই।

—হয় তো বা তাই।—হরিদ্রাভ সেই পত্রফলক হাতে নিয়ে ভাল করে লক্ষ করেন রঘুনাথ কুঙ্কুমিত কোন সুচারু অধররেখার আলিম্পন সংকল্পের আনন্দ হয়ে ফুটে রয়েছে পত্রফলকের বুকের উপর।

রঘুনাথের এই বিহ্বল নিশ্চুপতা ঐ পত্র প্রস্তাব সমর্থন করছে একথা অনুমান করতে ভাস্করের তিলমাত্র অসুবিধা হল না। অবশ্য তাঁর কাছেও অজানা রয়েছে কোন্ কজ্জলাক্ষীর হৃদয়োৎসারিত প্রেম বহন করে এনেছে রাগচিত্রিত ঐ দেওদারের পত্র ফলক।

—ভাস্কর। হঠাৎ আহ্বান করেন রঘুনাথ।

—আমার সংশয় মার্জনা কর। বল আমার প্রণয়াকাঙ্খিনী কে এই বরবর্ণিনী ?

—জানি না।

—জান না !

—কিছুই জানি না, শুধু জানি যার কাছ থেকে এই দায়িত্ব বহন করে এনেছি অনলশিখার মত পবিত্র ও সত্য সে।

—তবে ? বৈশাখী অপরাহ্নের ঝঞ্ঝার মত চঞ্চল শোনা যায় রঘুনাথের কণ্ঠস্বর।

কক্ষের বাতায়নের কাছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। নিষ্প্রভ হয়ে আসছে অপরাহ্ন মিহির।

সত্যাই বৈশাখী ঝঞ্ঝার রুদ্ধ নিঃস্বন নিকটতর হয়ে আসছে।

ভাস্কর ডাকে—রঘুনাথ !

রঘুনাথ—বল বন্ধু।

—তোমার হৃদয় অশান্ত করে দেবার জন্য দুঃখিত তবে আমি বিশ্বাস করি এই ক্ষণ বৈশাখের খরবর্ষণের পর তৃষিত বসুধার মত তুমিও তৃপ্ত হবে একদিন। প্রত্যয়তৃপ্ত শোনা যায় ভাস্করের কণ্ঠস্বর।

—কিন্তু কোথায় সেই প্রেমাকাঙ্খিণী ? আলো-ছায়ার রহস্যের অদৃশ্য থেকে প্রেমাভিলাষিণী,—কে সে ?

রঘুনাথের পীড়িত কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি ওঠে,—কে সে ?

—কোথায় সে ?

সত্যাই এক প্রতীক্ষার তপস্যা শুরু হয়ে গেল। রঘুনাথের শুদ্ধ পৌরুষ বাঞ্ছিতার উদ্দেশ্যে সাগ্রহ আহ্বান মন্দ্র সমীরণ তাড়িত হয়ে নিরন্তর মন্দ্রিত হতে থাকে।

কবে জানি না।

কখন কি ভাবে।

যোতবিহারের পুরদ্বার পার হয়ে ফিরে যান ভাস্কর সিংহ। প্রিয়া প্রমদাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি যথাযথ পালন করে ফিরে যান তিনি।

*　　　*　　　*

রাজসিক আড়ম্বর দিয়ে নয়, শুধু দেব অনুগ্রহ লাভের কামনায় বৈভবহীন এক তীর্থ যাত্রার আয়োজন সমাপ্ত করলেন রাজর্ষি নৃসিংহদেব। এক ক্ষীণাশার গুঞ্জরণ বুকে নিয়ে সপরিবারে তীর্থযাত্রা করলেন তিনি। প্রধান পুরোহিত আচার্য অর্কদেব ও আরো কয়েকজন রাজার অনুগামী হলেন। এক সহস্র সুদক্ষ দেহরক্ষী সৈনিক ও দৈনন্দিন জীবনের পরিচর্যার জন্য পরিচারক, পাচক ইত্যাদি সমভিব্যাহারে তীর্থযাত্রা করলেন রাজা নৃসিংহদেব।

যোতবিহারের বিদ্রোহ দমিত হওয়ার পর রাজ্য নিষ্কণ্টক হয়েছে এবং স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে ভেবে আশ্বস্ত ছিলেন রাজা নৃসিংহদেব। তাই

শক্তিমান সেনাপতির উপরই সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে মহামন্ত্রীর সহায়তায় রাজ্য চালনার দায়িত্ব অর্পণ করে গেলেন রাজা নৃসিংহদেব।

সন্ধ্যাগমে প্রতীচীর ললাট অরুণিত হয়েছে।

সফল হয়েছে কংসারীর প্রতীক্ষা। প্রদ্যুম্নপুরের দুর্গাভ্যন্তরে নীরব রাজপ্রাসাদের মন্ত্রণা কক্ষের সুরম্য বিশাল অলিন্দে পদচারণা করে সেনাপতি কংসারী।

এক সময় পদচারণা থেকে বিরত হয়ে কংসারী রাজ দরবারের দিকে তাকিয়ে থাকে। নানা পরিকল্পনা তার মনকে প্রভাবিত করছে।

দৌবারিক এসে অভিবাদন করে দাঁড়ায়।

—কি সংবাদ?

—অমাত্য মহীরাম সাক্ষাৎ প্রার্থী—

—মন্ত্রণা কক্ষে,—না—না অবিলম্বে তাকে এইখানেই আসতে বল।

কংসারীর ক্রূরচক্ষু আশান্বিত হয়। মহীরাম কর্তব্য পালনে তার একজন বিশ্বাসী সহযোগী অমাত্য।

মহীরাম অল্পক্ষণের মধ্যেই অলিন্দে পদার্পণ করল।

সম্মান প্রদর্শন করে মহীরাম বলল, মহামন্ত্রী, ভাস্করের সৈন্যবাহিনী, অপর কয়েকজন অমাত্য এবং সর্বোপরি যোতবিহার বাধা হয়ে দাঁড়াবে মহামান্য সেনাপতি।

কংসারী ভ্রুকুঞ্চিত করল।

—অর্থাৎ?

—এরা নৃসিংহদেবকে ছেড়ে আমাদের কোনরূপ সাহায্য বা সহযোগিতা দেবে না বরং বিরুদ্ধাচারণ করবে।

—যোতবিহারেব রঘুনাথ কি চায়?

প্রকৃতপক্ষে সে কি চায় তা আমার অজ্ঞাত। তবে প্রদ্যুম্নপুরের মহামন্ত্রী ও অমাত্যগণ যদি সকলেই আপনার পক্ষ নিতেন তা হলে রঘুনাথের বাধায় কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হত না।

—তুমি চেষ্টা করেছিলে?

—হ্যাঁ মহামান্য সেনাপতি। তাঁরা রাজী হন নি উপরন্তু প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন কয়েকজন।

কংসারীর দেহের সমস্ত রক্ত উধর্বগামী হল।

মনে মনে ভাবে কংসারী মূর্খদের এই গগনচুম্বি স্পর্ধার উপযুক্ত উত্তর একদিন অবশ্যই দেবে সে। মূর্খরা জানে না শার্দুলের বিরুদ্ধে শৃগালের ঔদ্ধত্য মৃত্যুকে তরান্বিত করে মাত্র।

কিছুক্ষণ চিন্তিত রইল কংসারী।

মহীরাম ইতঃস্তত করতে লাগল।

—ভেবেছিলাম নির্বিবাদে প্রদ্যুম্নপুরের সিংহাসন অধিকার করব, তা যখন হবে না তখন শক্তি প্রয়োগ করতেই হবে। দৃঢ় শোনা যায় কংসারীর কণ্ঠস্বর।

—কিন্তু প্রজাকুল তা কি মেনে নেবে? কিঞ্চিৎ ক্লান্ত ও সন্দিহান মনে হয় মহীরামকে।

পুত্রহীন রাজার একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করলে সিংহাসন লাভে কোন বাধা থাকবে না মহীরাম।

কংসারীর কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বল এক আশ্বাস হর্ষান্বিত হয়। কামনার এক প্রজ্বলন্ত শিখা যেন দাবানলের জ্বালা নিয়ে উদ্ধত আকাঙ্ক্ষাচারী কংসারীর বুকের ভিতর মুহূর্তে প্রবেশ করে।

—যে কোন মূল্যে আমাকে পরিকল্পনা রূপায়িত করতেই হবে। কিন্তু প্রস্তুতির জন্য সামান্য সময়ের প্রয়োজন।

—এখন আশু কর্তব্য কি?—জিজ্ঞাসা করে মহীরাম।

—অর্থ, প্রচুর অর্থ চাই। উৎকোচে বশীভূত করতে হবে আরও কিছু রাজকর্মচারীদের।

মহীরামেরও এক মত।

আলোচনার পর ঠিক হল প্রদ্যুম্নপুরের পার্শ্ববর্তী জনপদগুলি লুণ্ঠন করে অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহ করা হবে।

অস্থিরতার প্রান্ত সীমায় এসে পৌঁছাল কংসারী।

অনুভব করে কংসারী নবোদ্ভিন্নযৌবনা নৃসিংহদুহিতার যৌবন এবং প্রদ্যুম্নপুর রাজ সিংহাসন অধিকারের আশা তার ধমনীর রক্তস্রোতে তরঙ্গিত হচ্ছে।

শ্যাম বনভূমির উপান্ত পার হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে গ্রাস করে জনপদ। প্রতিদিনের মত দুর্গফটকে, প্রাসাদ অলিন্দে আলো জেলে দিল বাতিদার।

মুখে এক অগম্য শ্লেষাক্ত হাসির রেখা ফুটিয়ে দুর্গফটকের বাইরে বেরিয়ে এলো কংসারী। সঙ্গে মহীরাম ও আরও পঞ্চাশৎ অশ্বারোহী।

রাত্রির অন্ধকার। শুকতারার আলোক।

নিস্তব্ধ অন্ধকারে অশ্বগুলি ছুটিয়ে দিল তারা, দূরান্তে কোন জনপদের নিশিথ শান্তি ছিন্ন করে খঞ্জর রক্তাক্ত করে লুণ্ঠন চলবে তা এই মুহূর্তে বোঝা গেল না।

*　　　　*　　　　*

দিন যায়। অভিষ্ট কামনায় তীর্থ যাত্রায় দূরস্থানে গিয়েছেন প্রজানুরঞ্জক রাজা নৃসিংহদেব। বিমর্ষ হয়ে গিয়েছে, ক্রুর কিরাতের কার্মুকের আঘাতে আহত মৃগের মত ভয়বিহ্বল হয়েছে পুরবাসী। নিয়ত ধর্ষিতা হচ্ছে নারী। রাজপুরী মুখর হয়ে উঠছে দস্যুস্পর্শদূষিতা কুমারীর ক্রন্দন ও জনতার হাহাকারে।

নিরুপায় মহামন্ত্রী মন্ত্রণা আহ্বান করলেন। আহ্বান করলেন সকলকে। আহূত হলেন সামন্ত রাজ যোতবিহারাধিপতি রঘুনাথ। কিন্তু রাজানুরাগি কতিপয় অমাত্য এবং রঘুনাথ ব্যতীত অপর কেউ সেই আহ্বানে সাড়া দিল না। এমনকি সেনাপতি কংসারী যার উপর রাজ্যের শুভাশুভের ভার অর্পণ করে গেলেন মহারাজ নৃসিংহদেব। সেও এলো না।

সন্ধ্যা সমাগত।

অপেক্ষা না করে শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূলে মন্ত্রণা আরম্ভ করলেন মহামন্ত্রী। কিন্তু আশার পথ দৃষ্ট হল না। এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না যে সেনাপতি কংসারী রাজ্য অধিকার করে সিংহাসন লাভের আশায় সুযোগের অপেক্ষা করছে। সেনাপতির অনুচরের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়ে বৃহৎ আকার ধারণ করেছে। মাত্র কিছু সমর্থক নিয়ে প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া মূর্খতার পরিচায়ক। অবশেষে স্থির হল রাজ্যের জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে রাজার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অরাজকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো হবে। সেনাপতির কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হবে।

সভা ভঙ্গ হল।

ও দিকে—

রাজ্যের বহিঃসীমানায় স্রোতস্বিনীর উপান্তে নিরীক্ষণ মঞ্চের প্রশস্ত চাতালে কংসারী সঙ্গীদের নিয়ে আলোচনারত। বৃদ্ধ রাজা নৃসিংহদেবকে হত্যায় যদি প্রজা বিদ্রোহের সম্ভবনা থাকে তবে তাকে উন্মাদ প্রতিপন্ন করে রাজকার্য চালনার দায়িত্ব নিজ হাতে রেখে সময় ও সুযোগ বুঝে রাজকুমারীকে বিবাহ করে সিংহাসন অধিকারের পরিকল্পনা আর একবার শাণিয়ে নেয় কংসারী। ইতিমধ্যে লুণ্ঠন চালিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে শক্তিশালী হতে চায় কংসারী। চতুর্দিকে তার অনুচর লুণ্ঠনে ব্যাপৃত আছে।

রাত্রি গভীর হয়ে চলেছে।

দূরাগত অশ্বের পদশব্দে উৎকর্ণ হয় সকলে।

শব্দ দ্রুত নয় মন্থর।

দুটি অশ্ব এগিয়ে আসছে।

তারা থামল।

—কে ?—কংসারী প্রশ্ন করে।

—আমি মহামান্য সেনাপতি। গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেয় মহীরাম।

মশাল জ্বলে!

চমকে ওঠে কয়েক জোড়া চক্ষু।

একটি অশ্বের পিঠের উপর একজন সৈনিকের মৃতদেহ বহন করে এনেছে মহীরাম। অস্ত্রাঘাতে তার মস্তক বিদীর্ণ হয়েছে। বিদ্ধ হয়েছে বক্ষ, রক্তাপ্লুত সৈনিকের মৃত্যু ঘটেছে অনেকক্ষণ।

—কে করেছে এই কাজ ?—উত্তেজিত কংসারীর কণ্ঠস্বর।

—রঘুনাথ!

—রঘুনাথ! বিস্ময়ে বিরক্তিতে ফেটে পড়ে কংসারী।

—হ্যাঁ সেনাপতি। পশ্চিম সীমান্তে আমার দল নিয়ে একটি জনপদ লুণ্ঠন করে ফিরবার সময় জঙ্গল-ভূমির উত্তর পশ্চিম অরণ্যপথে কজঙ্গলের একটি শকটবাহী দলের সাক্ষাৎ পেয়ে শকট লুণ্ঠন করে বিপুলযৌবনা এক সাঁওতাল রমনীর সাক্ষাৎ পাই।

—তারপর ? কংসারীর স্বরে অস্থির ঝঞ্ঝা।

—মাধুর্যমণ্ডিত অনিন্দ্য সেই নারীর মুখশ্রী। যেন শীলা খোদিত অপার্থিব বক্ষপট। তারই বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসছিলাম মহামান্য সেনাপতি।

—তারপর ? তান্মুগ্ধ ভুজঙ্গের মত স্থির কংসারী।

—তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। অতিক্রান্ত হয়েছে প্রহর।

যোতীবিহারের নিকটবর্তী অরণ্যভূমির মধ্যে পথ চলতে চলতে পিছিয়ে পড়েছিলাম আমরা দুজন।

—কেন ? হঠাৎ যেন আর্তনাদ করে কংসারী, পরমুহূর্তেই আবার বলে, বুঝেছি। বল তারপর কি হল ? ঔৎসুক্যে চঞ্চল কংসারী।

মুহূর্তকাল নিশ্চুপ থেকে আবার বলে মহীরাম।

—বসনবন্ধন স্খলিত হতেই চিৎকার করে ওঠে সেই সাঁওতাল রমণী—"বাঁচাও, রক্ষা কর।" আর ঠিক তখনই আমার বিস্ময়বিচলিত চোখের সামনে অরণ্যের অন্ধকার ভেদ করে মুক্ত তরবারি হাতে অশ্বারূঢ় এক বলদর্পী যুবক আবির্ভূত হল। কিছু ভাববার আগেই তার মুক্ত তরবারি এই সৈনেকের বক্ষ ভেদ করেছে।

—আর তুমি ? শ্লেষাক্ত শোনায় কংসারীর স্বর।

—অন্ধকার এক বৃক্ষতলে দাঁড়িয়ে দেখলাম সেই নারীকে নিজ অশ্বে তুলে নিল আগন্তুক। আমার সাধ্য ছিল না সেই মহাবলীর সম্মুখীন হয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা। সে মশাল জেবলে চারিদিক দেখতে লাগল। তার শরীর শোভা প্রকট

হয়ে উঠলো। অন্ধকারের নিভৃত হতে আমি রঘুনাথকে স্পষ্ট চিনলাম। বলকুশল বাম বাহু দিয়ে সে ভীতা সেই নারীকে বেষ্টন করে দক্ষিণ বাহু দিয়ে অশ্ববলগা আকর্ষণ করে তীব্র বেগে অশ্ব ছুটিয়ে দিল।

একটু নীরব থেকে কংসারী বলে,

—এখনই কোন আদেশ উপস্থিত করব না, তবে আমাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হলে সবাইকে বিপদে পড়তে হবে।

—কিন্তু রঘুনাথকে রোধ করতে না পারলে—, মহীরামের বক্তব্য শেষ হল না তার সঙ্গে সহমত পোষণ করে কংসারী উত্তর দিল।

—তুমি যথার্থ বলেছ, কিন্তু প্রায় অসম্ভব এই কার্য সম্পন্ন করতে অগ্রসর হবে কে?

—আমরা সবাই।

নিঃশব্দ হাসির তরঙ্গে কংসারীর ওষ্ঠ আরো বঙ্কিম হয়ে উঠলো।

অরণ্যপথের আলোছায়া যেন দুর্বোধ্য এক স্বপ্নালোকের রূপ নিয়ে আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। তারই মধ্য দিয়ে দ্রুত অশ্ব চালনা করছিলেন রঘুনাথ। রঘুনাথের বামভুজবেষ্টিত হয়ে নীরবে বসে আছে ফুলকী। পিতার স্নেহনীড়ে ফিরে যাবার আশায় স্পন্দিত কুমারী বক্ষ। মধ্যরজনীর ক্ষীণ নক্ষত্রলেখা বনানীর পুষ্পগুল্ম ও লতায় চূর্ণ জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আলোছায়ার মায়া সৃষ্টি করে। মুখ তুলে তাকায় ফুলকী। হৃদয়ের সকল আগ্রহ নিয়ে একটি হাত বাড়িয়ে রঘুনাথের বিশাল স্কন্ধ স্পর্শ করে ফুলকী।

—দাদা।

রঘুনাথের হঠাৎ চোখে পড়ে, ফুলকী তারই দিকে তাকিয়ে আছে। ফুলকীর কৃতজ্ঞ চক্ষুর দৃষ্টি যেন নীরবে আবেদন করছে।

—কি বলতে চাও বোন?

মেঘমুক্ত শশীলেখার মত স্মিতদ্যুতিময় প্রসন্নতা ফুটে ওঠে ফুলকীর দুই চোখে।

—আমার এই ছোট উপহারটি তুমি নেবে দাদা?—একটি ছোট দ্যুতিময় হীরক গ্রথিত ছিল ফুলকীর নাকছাবীতে। ত্বরিতে সেটি খুলে এনে রঘুনাথকে উপহার দিতে চায় অরণ্যদুহিতা ফুলকী।

হেসে ওঠেন রঘুনাথ—।

—তোমাকে কে দিয়েছে ওটা?

—আমার বাবা। গড়মন্দারনের হীরাখনিতে কাজ করতে গিয়ে আমার বাবা এটা এনে দিয়েছেন আমায়।

—তোমার দাদা কি তোমাকে দেওয়া কোন জিনিস নিতে পারে ? তারই তো দেওয়া উচিত।

শব্দহারা উচ্ছ্বাসে আদ্র' হয় ফুলকীর মন, পুলকিত হয় লালিতনমিত দেহ।

—আশীর্বাদ কর দাদা আমি যেন তোমার সত্যিকারের বোন হতে পারি।—পুজাপ্রদীপের শিখার মত বিচ্ছুরিত হয় ফুলকীর তাৎক্ষণিক অভিব্যক্তি।

উ'চু নীচু গৈরিক প্রান্তর ভেদ করে ছুটে চলে অশ্ব। অজলা উষর অরণ্যভূমি দক্ষিণে ফেলে বামে অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিভাগের দিকে ভুজঙ্গায়িত গতি একটি পথ দৃষ্টিগোচর হতেই শকটবাহীদের দেখা গেল।

টিলা পর্বতের সানুদেশ বিশেষ জঙ্গলাকীর্ণ নয়।

অরণ্যের তরুশীর্ষ চুম্বন করে ছায়াকুঞ্জের অভ্যন্তরে নবোষার অরুণিমা প্রস্ফুটিত হচ্ছে।

শকট দৃষ্টিগোচর হতেই চিনতে পারে ফুলকী।

অশ্বের গতিরুদ্ধ করে দাঁড়ায় রঘুনাথ। ফুলকীকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসে সবাই। আনন্দে চিৎকার করে ওঠে তারা। যাত্রা রুদ্ধ করেছে সবাই।

রঘুনাথ একটি পত্রচ্ছদ বৃক্ষের নীচে উপবেশন করেন। অশ্বটি ইতঃস্তত বিচরণ করে ক্ষুধা নিবৃত্তি করছে। হিংস্র প্রাণী এই অঞ্চলে আছে কিনা জানা নেই। থাকলে, নির্বিরোধ অশ্বটি বেঘোরে প্রাণ দেবে। কোষ থেকে অসিমুক্ত করে রঘুনাথ সতর্ক রইলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম চাই।

আলোকে আপ্লুত হয়ে উঠেছে বনানী প্রান্তর। অপসৃত খিন্ন কুহেলিকা, ধীরে ধীরে রঘুনাথের সম্মুখে এসে দাঁড়ায় ফুলকী। রঘুনাথের পদস্পর্শ করে কৃতজ্ঞ দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রসারিত করে তাকায়।

—তোমাকে আমার চিরদিন মনে থাকবে দাদা। যৌনলুণ্ঠক দস্যুদলের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেছ বলে আমার সমগ্র জাতি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

—যাও বোন কজঙ্গলে পিতার আশ্রয়ে ফিরে যাও। তোমার সহযাত্রীদের নিয়ে যাত্রা কর। ভয় নেই দিনের আলোয় অরণ্যপথ পার হয়ে যাবে।

যাত্রা করে যাত্রীদল।

গাত্রোত্থান করলেন রঘুনাথ। অশ্বটির মুখরজ্জু ধরে নিয়ে এলেন। হাত সঞ্চালন করে মার্জনা করে দিলেন মসৃণ অশ্বদেহ।

সম্মুখে তাকিয়ে দেখলেন। ধাবমান শকটে বসে এই দিকেই তাকিয়ে আছে ফুলকী বিষণ্ণ একখণ্ড মেঘের মত।

স্তব্ধ দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করলেন রঘুনাথ। অশ্বারূঢ় হয়ে ধীরে অশ্ব চালনা

করে দিলেন। ঊর্ধ্বায়িত তরুরাজী প্রভাত সমীরে মর্মর ধ্বনি তোলে। বৃন্তচ্যুত হয়ে ঝরে পড়ে পত্র মালিকা।

রঘুনাথের বুকের মধ্যে যেন এক দুরন্ত বিদ্যুত অশান্ত হয়। ক্ষরিত পত্রালিকার স্পর্শে তন্ময় হয় রঘুনাথ। প্রতিটি পরিপাতিত পত্রের উপর কুঙ্কুমরাগ রঞ্জিত এক নর্ম অধর স্পর্শ যেন মূর্ছিতা হয়ে রয়েছে।

অরণ্যপুষ্পের সৌগন্ধ বাতাসে ছুটাছুটি করে।

রঘুনাথের অশ্ব ছোটে।

*　　　　*　　　　*

প্রদ্যুম্নপুর রাজপ্রাসাদে বৈতালিকের গীতস্বর আর শোনা যায় না। অবশিষ্ট কিংকর ও কিংকরীর দল প্রতিক্ষণের প্রহর একের পর এক অতিক্রম করছে। মনের সকল আবেগ ও আকুলতা ধৈর্যে স্তব্ধ করে রেখে রাজপ্রত্যাবর্তনের মুহূর্তের প্রতীক্ষায় তারা ধ্যানলীন।

ইতিমধ্যে দুর্গপ্রহরায় নিযুক্ত কতিপয় প্রহরীর পরিবর্তন ঘটিয়ে সেনাপতি নির্বাচিত প্রহরী মোতায়েন হয়েছে। প্রাসাদ রক্ষীদের মধ্যেও ধীরে ধীরে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে লক্ষ করা যায়। মহামন্ত্রী প্রেরিত এই সংবাদ পেয়ে চিন্তিত হলেন রঘুনাথ। সমস্ত দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যা পর্যন্ত চিন্তা করে আলোর সন্ধান পেলেন রঘুনাথ।

বিলম্ব করলেন না। দুইজন বিশ্বস্ত অনুচরকে সন্ধ্যা অতিক্রম হতেই শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে রওনা করে দিলেন।

রাজা নৃসিংহদেবকে সংবাদ দেওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সেনাপতি কংসারীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করার কথা জানিয়ে দূত প্রেরণ করলেন রঘুনাথ।

কিন্তু সন্ধ্যার প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হওয়ার মুখে যে নাটকীয় ঘটনা শুনলেন তার জন্য সত্যই প্রস্তুত ছিলেন না রঘুনাথ। সঙ্কুচিতভাবে দ্বারে এসে দাঁড়ালো অঙ্গদ। তার বক্তব্য থেকে জানা গেল।

প্রদ্যুম্নপুরের মহামন্ত্রী এবং দুইজন অমাত্যকে আটক করে, প্রকৃতপক্ষে বন্দী করে রাজপ্রাসাদেই আবদ্ধ করেছে কংসারী। প্রচার করেছে রাজসম্পদ লুণ্ঠন করবার জন্য নাকি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল এরা।

রঘুনাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করে কি যেন চিন্তা করলেন। সতর্ক প্রহরীদের মধ্যে বাস করছে কংসারী, বাইরে থেকে আক্রমণ করা বাতুলতা জেনেও রঘুনাথ নিজের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন।

—কিছুসংখ্যক দেহরক্ষী নিয়ে আমি প্রদ্যুম্নপুর যাত্রা করতে চাই অঙ্গদ। এই মর্মে ইতিমধ্যেই দূত প্রেরণ করেছি। জানতে চাই কি বলতে চায় কংসারী। —দৃঢ়প্রতিজ্ঞা শোনা যায় রঘুনাথের কণ্ঠস্বরে।

—কিন্তু কংসারী সঙ্ঘবদ্ধ রাজা।

—না। সকল অমাত্য তার স্বপক্ষে নয়। অত্যাচারী সকলের হৃদয় জয় করতে পারে না।

—আপনি কিভাবে অগ্রসর হতে চান রাজা ?—অঙ্গদের কণ্ঠে আগ্রহী সুর।

—প্রথমেই হানাহানির মধ্যে না গিয়ে নিজের উপস্থিতি দিয়ে বুঝতে চাই কংসারীর মনোবল কতটা দৃঢ়।

—যদি আপনাকে সে আক্রমণ করে ?

—তুমি পশ্চাতে রইলে অঙ্গদ, আমি আক্রান্ত হবার সংবাদ পেলে যোতবিহারের সৈন্যবাহিনী নিয়ে তুমি প্রদ্যুম্নপুর আক্রমণ করবে।

—যথা আজ্ঞা রাজা।—বিশ্বস্ত সৈনিকের মত ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে অঙ্গদ।

রাজভবনে রাত্রি কুণ্ডলিত হয়ে আসে। রঘুনাথ অঙ্গদকে সঙ্গে নিয়ে পিতা পঞ্চানন ঘোষালের কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হলেন। কয়েক দিন কিঞ্চিৎ অসুস্থবোধ করছিলেন পঞ্চানন ঘোষাল। রঘুনাথকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে শয্যায় উঠে বসলেন তিনি।

ঘটনা বিশ্লেষণ করে সমস্ত তথ্য নিবেদন করলেন রঘুনাথ। সমস্ত শুনে কার্যক্ষেত্রে নেমে পড়তে মত দিলেন তিনি। কেন না তা না হলে ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় না।

পিতার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন রঘুনাথ। পঞ্চাশৎ সংখ্যক দেহরক্ষীকে প্রস্তুত করবার জন্য আদেশ দিলেন।

বিনা বাক্যব্যয়ে দ্রুত চলে গেল অঙ্গদ। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হতে হতে প্রদ্যুম্নপুরাধিপতি মহারাজ নৃসিংহদেবকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুত কর্তব্যের জন্য আগ্রহ-চঞ্চল হয়ে উঠলো তাঁর মন।

জ্যোৎস্নালিপ্ত রাত্রি। পঞ্চাশৎ রণাশ্বের মুখরজ্জু ধরে সশস্ত্র পঞ্চাশৎ সৈনিক রাজাদেশের অপেক্ষায় অচঞ্চল দাঁড়িয়ে আছে, কেবল ধাবনোন্মুখ অশ্বের চঞ্চল অস্থৈর্য ছাড়া আর কোন চাঞ্চল্য কোথাও ছিল না।

প্রস্তুত হলেন যোতবিহারাধিপতি রঘুনাথ।

—বিদায় বন্ধু।—অঙ্গদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্যে উদ্ভাসিত হল তাঁর মুখমণ্ডল।

পরমুহূর্তেই অশ্বারূঢ় হয়ে ছুটে চলে যান।

তাঁকে অনুসরণ ক'রে ধাবিত হয় পঞ্চাশৎ রণাশ্ব।

স্তব্ধ দিগন্তে অশ্বখুরধ্বনি সঞ্চালিত হ'য়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

ঘোতবিহারী দূত রঘুনাথের সাক্ষাৎবাসনা নিবেদন করে চলে গিয়েছে। দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হবার পর থেকেই চিন্তিত ছিল কংসারী। মহামন্ত্রী ও অমাত্যগণের বন্দীর সংবাদ প্রচার করতে নগর পরিক্রমায় বেরিয়ে গিয়েছে ঘোষক। সরল প্রাণ নগরবাসী রাজার অবর্তমানে রাজসম্পদ লুণ্ঠনের সুযোগ নিচ্ছিল শুনে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে।

কিন্তু রঘুনাথ ?

অবশেষে আলোর সন্ধান পায় কংসারী। নিজ বিশ্বস্ত সৈনিকগণকে প্রস্তুত রেখে অপেক্ষা করে কংসারী।

ক্রমে অপরাহ্নের ছায়া দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে হতে এক সময় সন্ধ্যা নামে।

দুর্গপ্রাচীরের এ প্রান্তে অনুচরদের সতর্ক রাখে কংসারী। কয়েকজন অনুচর নিয়ে দুর্গফটক থেকে বেরিয়ে ঘন রাত্রির নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে এসে দাঁড়ায় কংসারী। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় কিছু দূর। হঠাৎ লক্ষ করে কংসারী একজন অশ্বারোহী জলন্ত মশাল নিয়ে ছুটে আসছে।

কোন সংবাদ বাহক কি ?

চিন্তার সূত্র খুঁজে পাবার আগেই অশ্বারোহী বিদ্যুৎবেগে তার দেহ আলোকিত করে ফটকের দিকে ধাবিত হল। কংসারী দ্রুতপদে দুর্গফটকে ফিরে এলো।

মশালধারী দুর্গফটকে তারই অনুচর পরিবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সেনাপতিকে দেখতে পেয়ে অভিবাদন ক'রে মহীরাম জানাল—ঘোতবিহারের অগ্রদূত। রাজা রঘুনাথ আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রওনা হয়েছেন সেনাপতি।

—তাঁকে সসম্মানে প্রাসাদে নিয়ে যাবার জন্য আমরা ফটকের বাইরেই অপেক্ষা করছি। তাঁর সঙ্গে মূল্যবান আলোচনা করবার জন্য আমি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে রয়েছি। আমরা তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছি।

কালবিলম্ব করল না দূত। অভিবাদন করে অশ্ব ছুটিয়ে দিল।

—মহীরাম। কংসারীর কণ্ঠস্বরে ক্রূর ব্যস্ততা।

—আদেশ করুন।

—দুর্গফটকে পৌঁছানমাত্র সসম্মানে রঘুনাথকে দুর্গাভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। মন্দুরায় দেহরক্ষীদের অশ্বগুলি পাঠিয়ে দেবে। দেহরক্ষীদের বিশ্রামের জন্য অতিথি ভবনে নিয়ে যাবে। পানভোজনে আপ্যায়িত করে নিরস্ত্র অবস্থায় একে একে দুর্গফটকের বাইরে ছেড়ে দেবে।

রঘুনাথের ব্যবস্থা করব আমি স্বয়ং। ঠিক আছে ?

দ্রুত নির্দেশ দান করে কংসারী, পরক্ষণে ব্যস্ত চঞ্চল হয়ে দুর্গাভ্যন্তরে চলে যায়।

প্রস্তুত থাকে মহীরাম।

প্রস্তুত থাকে সেনাপতি নির্বাচিত সেনানী।

অনতিদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে দেহরক্ষী সৈনিকদের নিয়ে প্রদ্যুম্নপুরের দুর্গ-ফটকে এসে পেঁছিলেন রাজা রঘুনাথ। সঙ্গে সঙ্গে বহিঃফটকেই ছুটে এলো কংসারী, ছুটে এলো মহীরাম এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ। প্রীতি আহ্বানে মুখরিত হয়ে উঠলো পুরপ্রাঙ্গণ।

রঘুনাথের দেহরক্ষীগণ হতভম্ব হয়ে গেল।

অতিথিভবনে বিশ্রামের জন্য নীত হল তারা। রঘুনাথকে সাদরে আহ্বান করে বিশ্রামাগারে নিয়ে গেল কংসারী।

মনে মনে প্রতিজ্ঞ ছিল কংসারী, সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে এখন তাকে থাকতেই হবে। রঘুনাথের দুচোখের তারায় এখন যেন ঘনায়মান সন্দেহ। দ্রুত অল্প আয়াসেই যে দেহরক্ষীদের কাছ থেকে রঘুনাথকে পৃথক করে নিতে পারবে সত্যিই ভাবে নি কংসারী। অতিথিশালায় এতক্ষণ নিরস্ত্র বক্ষীদল। মনে মনে হেসে উঠলো কংসারী। ভাগ্য সদয় থাকায় এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে বিনা বাধায়। এখন শেষ রক্ষা নির্ভর করছে নিজের সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার উপর।

বিশাল প্রাসাদের প্রতিটি অংশ এখন নিঝুম নিস্তব্ধ। জনপ্রাণী আছে বলে মনে হয় না।

কেবল দুর্গফটকে, কারাপ্রাচীরের অলিন্দে নৈশপ্রহরীরা সজাগ। রঘুনাথের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছিল। এবার তিনি কংসারীকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে বললেন।

—বলুন মহামান্য সেনাপতি কংসারী, কি আপনার অভিমত।

—মহারাজের অনুপস্থিতিতে রাজ্য বিপন্ন হোক এটা নিশ্চয়ই আপনি চান না।—সতর্ক কংসারীর কণ্ঠ।

বিপন্ন? কোন দিক থেকে?—দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন করেন রঘুনাথ।

—সবদিক থেকেই; যেমন ধরুন রাজভাণ্ডার লুণ্ঠনের চেষ্টা। নগর লুণ্ঠন। —নির্বিবাদে বলে চলে কংসারী।

—এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে কারা?

—যাদের ঔদ্ধত্য গগনচুম্বি হয়ে উঠেছে।

—কাদের ঔদ্ধত্য?—এবার কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে প্রশ্ন করেন রঘুনাথ।

অর্থহীন সংলাপ বন্ধ করে রঘুনাথের মুখের উপর ক্রুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে কংসারী। তারপর শ্লেষাত্ত স্বরে বলে।

—এই যেমন আপনি?

—অর্থাৎ? উঠে দাঁড়ান রঘুনাথ।

—দাঁড়ান রাজা। অশ্বস্তি বোধ করবেন না।

আপনার দেহরক্ষীরা গভীর রাত্রে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নিরস্ত্র অবস্থায় একে একে প্রদ্যুম্নপুর দুর্গফটক ছেড়ে যোতবিহারাভিমুখে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে একথা আপনার জানা দরকার। বিদ্রূপাত্মক স্বর তোলে কংসারী।

—বিশ্বাসঘাতক!—ক্রোধে চিৎকার করে ওঠেন রঘুনাথ।

হেসে ওঠে কংসারী।—আপনি যাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলছেন আমি তাকে বলি রাজনীতি।

উচ্চহাস্যে রঘুনাথের বীর্যবত্তা যেন বিদ্রূপে ছিন্ন করতে চায় কংসারী।

ক্রোধের জ্বালা সহ্য করতে পারে না রঘুনাথের দুই চক্ষুর সাগ্নিক দৃষ্টি, চকিতে অসি উন্মোচন করেন তিনি।

কিন্তু।

বিশ্রামাগারের চতুর্দিক থেকে মুক্ত খঞ্জর হাতে ছুটে আসে সেনাপতির নির্বাচিত পঞ্চদশ সৈনিক। আবার অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ে কংসারী।

বন্দী হলেন রঘুনাথ।

রাতের প্রহর তখন কত?

ছোবল মারার আগে বিষধর সর্প যেমন খর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, অন্ধকারে তেমনিভাবে তাকিয়ে থাকেন রঘুনাথ।

সেই স্থির দৃষ্টির সামনে কারাগৃহের জমাট অন্ধকারও বুঝি আতঙ্কে কম্পমান।

অবশেষে অরণ্যভূমির প্রান্তে অনুচ্চ শৈলশ্রেণীর আবর্ত অতিক্রম করে শুশুনিয়ার চক্রস্বামীর মন্দির চত্বরে পেঁছে রাজকুমারী চন্দ্রের মিয়মান মন আশায় উৎফুল্ল হয়েছে। আজ তাই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে চন্দ্রকুমারী। পর্বতের সানুদেশে সবুজে সমাকীর্ণ উপত্যকায় রাজা নৃসিংহদেবের বিশ্রাম শিবির বেষ্টন করে দেহরক্ষীগণ অতন্দ্র প্রহরায় রাত্রি যাপন করছে। সারি সারি শিবির। এখন রাত্রির অন্ধকার তরল হয়ে এসেছে। শৈলকন্দরের অন্ধকারময় নিভৃত হতে ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছে ছিন্ন কুহেলিকা। কুয়াশা মলিন অরণ্য। রহস্য নিবিড়। জন বিরল, স্বপ্নালোকিত নির্জন পথ বেয়ে শালবীথি অতিক্রম করে মৃগয়াভিলাষে চলে গেল কয়েকজন সৈনিক।

শয্যা ত্যাগ করে শিবিরের বাইরে মহারাজ নৃসিংহদেব পদচারণা করছেন। অনেক রাজ্য ঘুরে এলেন তিনি কিন্তু কোথাও এমন কোন রূপবান তরুণের সাক্ষাৎ পেলেন না যাকে তাঁর রূপবতী কন্যা চন্দ্রকুমারীর পরিণেতা হবার জন্য আহ্বান করতে পারেন। কন্যার কল্যাণ কামনায় অনুলিপ্ত দুটি চক্ষু তুলে দেখতে পেলেন

রাজা নৃসিংহদেব রাণী সনকা শয্যা ত্যাগ করে শিবিরের বাইরে বেরিয়ে আসছেন। শ্রীক্ষেত্র থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে কুমারী চন্দ্র। তাই নিরন্তর চিন্তাক্লিষ্ট সকলেই। রাজার কাছে এগিয়ে এলেন রাণী সনকা। প্রাতঃ সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে কন্যার কুশল জানবার আগ্রহে চন্দ্রকুমারীর শিবিরের দিকে এগিয়ে গেলেন, রাজাও তাঁকে অনুসরণ করলেন। কন্যার শিবিরের দ্বারে রাজাকে অপেক্ষারত রেখে ভিতরে প্রবেশ করলেন রাণী। ক্লান্ত বীণার স্তব্ধ রাগিণীর মত মুদিত নয়নে শুয়ে আছে কন্যা চন্দ্রকুমারী। দেখলেন সনকা অধর মৃদু মৃদু কাঁপছে চন্দ্রকুমারীর, বিকচ বক্ষ ওঠা নামা করছে অতি ধীরে ধীরে। বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে সেই বিপুল যৌবন আচ্ছাদিত করে দিলেন রানী সনকা। এবার দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষমান রাজাকে আহ্বান করলেন।

দ্বার পতাকা সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন রাজা নৃসিংহদেব। তরুণী কন্যার ললাট স্পর্শ করে দেহের উত্তাপ অনুভব করলেন। রাজার উৎকণ্ঠিত চিন্তাকুটিল ললাট মসৃণ হয়ে এল। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন তিনি।

—আর ভয় নেই।

রাণী সনকার বুক থেকে পাষাণভার নেমে গেল। আবার ফিরে চাইলেন কন্যার ঘুমন্ত মুখের পানে। চন্দ্রকুমারীর প্রশান্ত মুখে তখন ঊষার প্রথম আলোকছটা এসে পড়েছে দেবতার আশীর্বাদের মত। মৃদুমন্দ বাতাসে উড়ছে তার সিঁথির ভ্রমরক।

চারি দিকে সজিব শুভ্রতা ভাসছে।

দ্বারের অংসুক যবনিকা ঠেলে ঈষদোষ্ণ তক্র পাত্র হাতে নিয়ে প্রবেশ করে প্রমদা। প্রত্যূষেই স্নান করে বরযৌবনা প্রমদা নিজেকে সজ্জিত করে নিয়েছে।

রাজা নৃসিংহদেব মহিষীর মুখের দিকে চাইলেন। দেখলেন জননীগর্ব তাঁর অধরে। নয়ন দুটি স্নেহমেদুর। হাসলেন রাজা। প্রমদার হাত থেকে পাত্র তুলে নিতে নিতে বললেন।

—আমাদের কল্যাণী কন্যা উৎসবে, ব্যসনে, তীর্থে কোথাও কর্তব্য ভোলে না।

হৃদয়ের নিবেদিত শ্রদ্ধার লাজাঞ্জলী রাজার পায়ের উপরে লুটিয়ে দিয়ে বলে প্রমদা। যেন প্রসঙ্গান্তর করতে চায়।

—সখী চন্দ্রকুমারীকে শয্যা থেকে তুলে প্রসাধন সমাপ্ত করে দিতে হবে পিতা।

—তোর বিবাহ হয়ে গেলে আমাদের কি হবে প্রমদা? স্নেহলীন শোনায় রাণী সনকার কণ্ঠস্বর।

—আমার বিবাহ হয়ে গেলে আমি তো তোমাদের কাছেই থাকব মা।— প্রত্যাশিত আনন্দের আলো প্রস্ফুটিত হয় প্রমদার কৃষ্ণকঞ্জপ্রভ দুই নয়নে।

স্নেহাবেগে প্রমদার স্তবকিত কেশদাম আকর্ষণ করলেন রাণী সনকা। মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গীতে বললেন।

—তোর অনুরাগ, পাতিব্রত্য, মাতৃত্ব সবই কি আমাদের কল্যাণের জন্য? তোর নিজের জন্য কিছুই নয়?

—তোমাদের আশীর্বাদই আমার সব, আমার ইহকাল আমার পরকাল। মন্ত্রবারিসিক্ত পুষ্পস্তবকের মত স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের জ্যোতিধারায় আলোকিত প্রমদার মুখ।

আর্দ্র হয়ে ওঠে রাজদম্পতির হৃদয়।

আর একবার প্রমদার মস্তক স্পর্শ করে আদর করলেন রাণী সনকা। তারপরই শিবির ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন দুজনে।

চন্দ্রকুমারীর শয্যাপার্শ্বে এগিয়ে যায় প্রমদা। সস্পৃহ নয়নে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে প্রমদা। বাষ্পাসারে মেদুর হয় হৃদয়। সেই কবে প্রদ্যুম্নপুরে রাজপ্রাসাদ থেকে পিতার সঙ্গে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে চন্দ্রকুমারীর দুই চক্ষুর কৌতূহল হঠাৎ উন্মেষ হারিয়ে রঘুনাথের প্রিয়মুখছবিকে স্বপ্নমায়ানুলীন অনুভবের মধ্যে দেখতে পেয়ে রিক্তা হয়ে গিয়েছে।

কে?

আমি সখী।

শয্যার উপর উঠে বসে চন্দ্রকুমারী। বিষাদালস দৃষ্টি তুলে প্রমদার মুখের দিকে তাকিয়ে রক্তিমাধর শিহরিত করে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভেঙে পড়ে চন্দ্রকুমারী।

—আমি এক অতি দুঃস্বপ্ন দেখেছি সখী। চন্দ্রকুমারীর বক্ষের নিঃশ্বাস ক্ষোভিত স্বরে আর্তনাদ করে।

—কি হবে সখী, আমার কি হবে?

সৌহার্দ্যভাবনায় ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে প্রমদা।

—কি এমন স্বপ্ন দেখেছ সখী যার জন্য হৃদয় এত ব্যাকুল হয়েছে?

—সে এসেছিল সখী। একপত্রচ্ছদ তমালের ছায়ায় তার সাকাঙ্ক্ষ চুম্বনে সিক্ত হয়েছিল আমার সকল অঙ্গ। হঠাৎ অন্ধকারে আবৃত হল চতুর্দিক। আমি দেখলাম আমার বুকের কাছে সে নেই আর আমার করপল্লব রঞ্জিত হয়ে রয়েছে তাজা রক্তে।—কি হবে সখী! এ কোন অকল্যাণের ইঙ্গিত?

—ভুল করছ সখী। প্রিয়জনের অকল্যাণ স্বপ্ন অপরকে বর্তায়। হয়তো বা কোন দুর্ভাগ্য সূচিত হবে আমার তোমাদের নয়।

—না। চিৎকার করে ওঠে চন্দ্রকুমারী, অধর স্ফুরিত হয়। বলো না, অমন কথা বলো না সখী। সুখী হও তুমি, সুখী হোক ভাস্কর।

সুন্দর অধরে যেন স্নিগ্ধ এক সান্ত্বনা সুস্মিত করে প্রমদা বলে।

—তবে চল সখী শ্রম জয় কর। স্নান সমাপন করে চক্রস্বামীর মন্দিরে প্রার্থনা নিবেদন করে আসি চল। প্রমদার কণ্ঠস্বর নিবিড় সান্নিধ্য রচনা করে।

ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে চন্দ্রকুমারী। মনে মনে ভাবে প্রমদা। কবে এই নীরব তপস্বিনী শবরীর শেষযাম ফুরাবে? কবে জাগবে ঊষাভাস।

কবে?

শিবিরের বাইরে এসে দাঁড়ায় চন্দ্রকুমারী ও প্রমদা! প্রভাত সূর্যের হরিদ্রাভ আলোর বন্যায় তরুশ্রেণীর শিখরচূড়া ঝলমল করছে। উজ্জ্বল আলোয় ঢেউ খেলান নীলাভ পর্বতদুর্গ প্রাকারের মত সীমারেখা টেনে চলে গিয়েছে দূরান্তে। পর্বতস্থলির উপান্তে পার্বত্য এক অরণ্য নির্ঝর। ঈষদোষ্ণ জলে স্নান করবার জন্য সখী চন্দ্রকুমারীকে সেই দিকে নিয়ে যায় প্রমদা।

ইতিমধ্যে অরণ্যঘন রমণীয় উপত্যকায় মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য পাচকগণ কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ওদিকে তপ্ত রৌদ্রের দংশন দেহে বরণ করে ভারবাহী শকটগুলি সাজিয়ে নিচ্ছিলেন ভাস্কর। ভোজনপর্ব দ্রুত সমাপ্ত করে শিবির তুলতে হবে। পাহাড়ের শরীরশোভা স্পর্শ করে দক্ষিণাঞ্চলে নেমে গিয়েছে নিবিড় অরণ্য। পৃথিবীর বুকে যেন এক রঙিন মরীচিকা। দিবাভাগে বিসর্পিল পার্বত্য পথ পার হয়ে সমতল স্পর্শ করতে চান ভাস্কর সিংহ। পাহাড়ের সানুদেশ থেকেই শুরু হয়েছে শালবন। নিশ্ছিদ্র, নিবিড়, তরঙ্গায়িত এই উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন ভাস্কর। হঠাৎ দেখতে পান ভাস্কর, দূরে অরণ্যক্রোড়ের তরঙ্গায়িত শালবীথিকার কিনার দিয়ে দুইজন অশ্বারোহী অশ্ব ছুটিয়ে এই দিকেই আসছে।

ক্রমে মূর্তিদ্বয় নিকটতর হয়। চিনতে পারেন ভাস্কর। দুইজনই সৈনিক।

একটু এগিয়ে চিৎকার করে হুঁসিয়ারী দিলেন ভাস্কর, সঙ্গে সঙ্গে রাজসৈন্যগণ সতর্ক হয়ে উঠলো। ত্বরিতে ধবল বস্ত্রখণ্ড মাথার উপর আন্দোলিত করে বন্ধুত্বের স্মারক সঙ্কেত দিল আগন্তুক অশ্বারোহীদ্বয়।

ভাস্করকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন দেহরক্ষী। আগন্তুকদ্বয় রঘুনাথ-প্রেরিত সংবাদবাহী দূত।

শুনতে পেলেন প্রদ্যুম্নপুরাধিপতি মহারাজ নৃসিংহদেব। তাঁর তীর্থযাত্রার সুযোগ নিয়ে কংসারীর চক্রান্ত প্রদ্যুম্নপুর রাজসিংহাসনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। প্রাসাদকেতনের গর্ব খর্ব করার জন্য মুখর হয়ে উঠেছে তার লেলিহান লোভ।

—শিবির তোল।

রবরোষিত কেশরীর মত রাজার ক্রোধকম্পিত আদেশ শুনে চমকে ওঠে সবাই। অকালিক ঝটিকার মত দ্রুত পেশীবহুল বাহুতে ভারবাহী শকটগুলি বোঝাই

করতে শুরু করল কিছু সৈনিক। পাচকগণ সংক্ষিপ্ত করে দিল মধ্যাহ্ন ভোজনের তালিকা। সর্বত্র একটি চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হতে লাগল।

সেই প্রথম জাগ্রত প্রহরের স্নিগ্ধ ক্ষুদ্র প্রস্রবণে স্নান করে মন্দিরে প্রার্থনারতা ছিল রাজকুমারী চন্দ্র। মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে উপত্যকার শান্ত প্রতিচ্ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ লক্ষ করে সে সহস্র কণ্ঠে ব্যস্ততার গুঞ্জন তুলে দ্রুত শিবির তোলার কাজে ব্যস্ত হয়েছে সবাই। ছায়াঘন বৃক্ষ-কুঞ্জের নীচে পিতা নৃসিংহদেব বিষন্ন বদনে পদচারণা করছেন। উৎসুক নয়নে ধীরে ধীরে পিতার কাছে এসে দাঁড়ায় চন্দ্রকুমারী। সাগ্রহ স্বরে বলে।

—কি হয়েছে পিতা!—বিস্ময়াভিভূত নেত্রে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করে চন্দ্রকুমারী।

—এখনি যাত্রা করতে হবে কন্যা।—বিষন্ন রাজার কণ্ঠস্বর।

—কেন পিতা, মনে হয় তুমি খুবই চিন্তিত?

চিন্তার কারণ ঘটেছে কন্যা। আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মহামন্ত্রী ও কয়েকজন বিশ্বস্ত অমাত্যকে মিথ্যা অপবাদে বন্দী করেছে সেনাপতি বংসাবী।

—পিতা?—ভ্রূভঙ্গী কঠোর হয় চন্দ্রকুমারীর।

· হ্যাঁ কন্যা। রঘুনাথ এই খবর দিয়ে দূত প্রেরণ করেছে।

—রঘুনাথ!—নিজ কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়ে চমকে ওঠে চন্দ্রকুমারী।

—হ্যাঁ রঘুনাথ। কয়েকজন দেহরক্ষী নিয়ে সে রাজধানীতে গিয়েছে।

—পিতা!—সহসা অশ্রুসজল চক্ষু তুলে প্রশ্ন করে চন্দ্রকুমারী, তার কোন অমঙ্গল·· কথা শেষ করতে পারে না চন্দ্রকুমারী। পিতার সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে অশান্ত হয় তার যন্ত্রণাক্ত বিরহী মন। প্রতিমুহূর্তের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে লালিত একটি গোপন আকাঙ্ক্ষা বিস্ফারিত ক্রন্দনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

আদরিণী কন্যার রূপসী ব্রীড়াকুণ্ঠিত নতমুখ পদপ্রান্ত হতে তুলে নিয়ে নিজের পিতৃহৃদয়ের উপর স্থাপন করেন পিতা নৃসিংহদেব। কন্যার স্তবকিত কুন্তলের উপর দক্ষিণ হাত মার্জনা করে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করেন।

—তুমি কি তাকে দেখছ কন্যা?

—হ্যাঁ পিতা। শয়নকক্ষের গবাক্ষ পথে বারেকের জন্য তাঁকে দেখেছিলাম। অবরুদ্ধ হৃদয়ের জ্বালা উন্মোচন করে পিতার কাছে·অকপট হয় চন্দ্রকুমারী।

ব্যাকুল হৃদয়ে বক্ষলগ্না কন্যার শির চুম্বন করেন রাজা নৃসিংহদেব। বলেন।

—যাও কন্যা প্রস্তুত হও। আমি প্রদ্যুম্নপুরের রাজা কিন্তু প্রদ্যুম্নপুরের রাজকুমারী চন্দ্রের সহৃদয় পিতাও—আমি আশীর্বাদ করছি তোমার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হবে না।

হর্ষাভিভূতা চন্দ্রকুমারী অশ্রুসলিলে পিতৃবক্ষ ভাসিয়ে দিয়ে মেরু মরালীর মত মন্দির প্রাঙ্গণের দিকে ছুটে চলে যায়।

অবশেষে মাথার উপর দিনমণির চক্ষু ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে। গিরিবর্ত্মের গৈরিক প্রান্তরে পর্বতের কৃষ্ণ প্রস্তরে আগুন জ্বলে।

শিঙা বাজে।

যাত্রা করে যাত্রীদল। তাদের প্রত্যেকের বুকে কংসারীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রোশ আগুনের মত জ্বলতে থাকে।

মধ্যাহ্ন বেলায় প্রদ্যুম্নপুরের রাজপ্রাসাদে সেনাপতি কংসারী সহযোগীদের নিয়ে বিশ্রামাগারে শীতল তক্র পান করছিল। প্রাসাদের পূর্বতন কিঙ্কর কিঙ্করীরা তাদের পাশ কাটিয়ে চলছিল। চোখ মাটির দিকে রেখে মাথা নীচু করে চলছিল তারা। ভয়ে বেদনায় আর অপমানে তাদের বুকের মধ্যে ঝড় বইছিল।

প্রাসাদ সংলগ্ন কানাই সায়রের উপান্তে কারাপ্রকোষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে বসেছিলেন রঘুনাথ। তাঁর মাথা নীচু, মুখ অন্ধকার। লৌহদ্বারের ফাঁক দিয়ে যৎসামান্য আলো সরু হয়ে কক্ষের মধ্যে ঢুকেছে। সেই ক্ষীণ আলোকরশ্মির দিকে তাকিয়ে মনে মনে আলোর প্রার্থনাই করছিলেন রঘুনাথ। ঠিক সেই সময়ে দুর্গফটক থেকে তীব্র শব্দে দামামা বেজে উঠলো। ছুটে গিয়ে লৌহদ্বারের সেই সামান্য ছিদ্রের মধ্য দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে দিতে চাইলেন রঘুনাথ। ফটকের অভ্যন্তরের এক অংশমাত্র দেখা যাচ্ছে। দ্রুত ছুটোছুটি করছে সৈনিক। মনে হল ঝন্ ঝন্ শব্দে দুর্গফটক বন্ধ হল।

ভাবতে লাগলেন রঘুনাথ তবে কি অঙ্গদ প্রদ্যুম্নপুর আক্রমণ করেছে? চিন্তিত হলেন রঘুনাথ। আবার ভাবতে থাকেন, নাকি অন্য কিছু? না ঠিকই অনুমান করেছেন রঘুনাথ।

যোতবিহারী বাহিনী নিয়ে রঘুনাথের উদ্ধারের প্রতিজ্ঞায় প্রদ্যুম্নপুরে পৌঁছে গিয়েছে প্রধান সেনাপতি অঙ্গদ রায়। কিন্তু প্রাসাদ দুর্গের বৃহৎ ফটক বন্ধ করে দিয়েছে কংসারী। দুর্গপ্রাকারের শীর্ষে তীরন্দাজী সৈন্য বসিয়ে দুর্গরক্ষার ব্যবস্থা করে কংসারী।

ওদিকে দুর্গপ্রাকারের বাইরে প্রদ্যুম্নপুরের বিশ্বস্ত কিছু অমাত্য তাদের সীমিত ক্ষমতা নিয়ে অঙ্গদের সঙ্গে যোগ দেয়। ছুটে আসে দলে দলে নগরবাসী। তাদের চোখ ক্রোধে ক্ষোভে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। চিৎকার করে তারা অভিশাপ দিচ্ছে কংসারীকে। কেউ রাজ মন্দিরে প্রার্থনা করছে রাজা নৃসিংহদেবের প্রত্যাবর্তন কামনায়। বস্তুতপক্ষে কংসারী সেই সুবিশাল ক্ষুব্ধ জনস্রোতের বেষ্টনীর মধ্যে দুর্গফটকের অর্গল রুদ্ধ করে অবরুদ্ধ হয়।

সৈনিকজনোচিত অভিনিবেশের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেল অঙ্গদ ও অমাত্যগণ। রঘুনাথের চিন্তা তাদের আবিষ্ট করে ফেলল। একটি অস্থির অনুভূতি শরীরের অণু-পরমাণুকে গ্রাস করে ফেলবে বুঝি। রঘুনাথের এই অপ্রত্যাশিত বন্দীর ঘটনা তার মনকে আলোড়িত করে তুলছে।

অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল প্রাসাদদুর্গ অবরোধ করে অপেক্ষা করা হবে। যে কোন ফটক খুলে বাইরে আসতেই হবে দুর্গসৈনিকদের। কেননা খাদ্য ; বিশেষতঃ পানীয় জলের জন্য একান্ত তাদের করতেই হবে। আর তখনই আক্রমণ সূচিত হবে।

সিংহদ্বারের সম্মুখে প্রশস্ত চত্বরে রাসমঞ্চের প্রাঙ্গণে ছায়া দীর্ঘতর হতে থাকে। আকাশের অনন্ত নীলিমা ধীরে ধীরে শোণিম হয়ে আসছে।

দুর্গফটকের সুউচ্চ প্রাকারের উপর দাঁড়িয়ে আছে দুর্গপ্রহরীগণ। তাদের দিশাহারা চক্ষু কিছুতেই অনুধাবন করতে পারে না—মহারাজ নৃসিংহদেবের অনুপস্থিতির সুযোগে রাজ্যভাণ্ডার লুণ্ঠন করতেই কি এগিয়ে এসেছে এই বিশাল জনস্রোত। এরা সবাই লুণ্ঠক ? বল্লম ও তীরন্দাজী সৈনিকেরা সন্দিগ্ধ-চিত্তে সেনাপতি কংসারীর এতাদৃশ প্রচারের তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করে।

ক্রমে জ্যোৎস্নামোদিত হয় প্রদ্যুম্নপুরের নিঃশ্বাসবায়ু। রাত্রি নামে। প্রদ্যুম্নপুরাধিপতি রাজা নৃসিংহদেবের ঐশ্বর্যসমাকুল বিরাট ভবনের অন্তরাত্মা আতঙ্কিত বিস্ময়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে।

রাত্রির শেষ যামে রাজা নৃসিংহদেবের রথ যোতবিহার থেকে দুইযোজন দূরের প্রান্তর স্পর্শ করল।

সারিবদ্ধ হয়ে বিশাল আকার সেই যাত্রীদল চলছিল। প্রান্তরের আশে-পাশে অগভীর জলাভূমি থেকে ভেসে আসছিল ভেককুলের একটানা তন্দ্রালু ডাক। বেণুবনে লাগে মৃদু সমীরণ শিহরণ। নবোষার আলো-আঁধারে অস্পষ্ট দেখা যায় পথিপার্শ্বস্থ দ্রুমবাহুর নবকিশলয়ের পাটল-শ্যাম শোভা। নীবশ্রী মৃত্তিকার বক্ষ থেকে লঘু জ্যোৎস্নার মত শুভ্র কুহেলীর জাল ধীরে ধীরে উঠে তরুমূলে লীন হয়ে যাচ্ছে।

ক্রমে উষারাগে শোণিত যোতবিহারের পাষাণের প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হয়।

দেশজ মাটির সুবাস যেন নিশ্বাসের সঙ্গে বুক ভরে গ্রহণ করে সবাই।

আনন্দধ্বনি মুখরিত করে প্রান্তর।

অশ্ববাহী শকটের দ্বারপথে মুগ্ধনেত্রে তাকায় চন্দ্রকুমারী। পশ্চাতে ফেলে আসা তীর্থ জীবনের সমস্ত পীড়া, সমস্ত বিরহ-বেদনা যেন এই মাটির স্পর্শে মুছে যায়।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এলেন রাজা নৃসিংহদেব। কিন্তু বর্তমানে পথ পরিক্রমার গতি অত্যন্ত মন্থর। কোন বাহিনী এত ধীর গতিতে চলেনা কখন। কিন্তু এ তো অভিযান নয়। এ প্রত্যাবর্তন। যে প্রত্যাবর্তনে আছে আশঙ্কা। তাই ইচ্ছা করেই শ্লথ গতিতে এগিয়ে আসছেন তাঁরা।

যোতবিহারে পেঁাছেই রঘুনাথের বন্দীর সংবাদ শুনতে পেলেন নৃসিংহদেব। রাজার বিষন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন ভাস্কর সিংহ।

—এখন আমাদের কি কর্তব্য মহারাজ।

—কংসারীর স্পর্ধায় আঘাত হানতেই হবে ভাস্কর। প্রদ্যুম্নপুরের সম্মান রক্ষা করতেই হবে। অবরুদ্ধ প্রদ্যুম্নপুরে যত দ্রুত সম্ভব পেঁাছান দরকার।

—যথা আজ্ঞা মহারাজ। আমি তদ্রূপ ব্যবস্থাই করছি।

শকটের মধ্যে চন্দ্রকুমারীর পিপাসিত অন্তর হাহাকার করে ওঠে। বিমর্ষ-ভাবে চিন্তান্বিত হয়ে বসে থাকেন রাণী সনকা। কেবল প্রমদা নিজ করতল কঠোর ক'রে অশ্রুধারা মুছে ফেলে মনে মনে বলে।—'যদি আমরা কোন অন্যায় না করে থাকি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত জীবন ব্যর্থ হবে না।'

নারীবাহী শকট এবং ভারবাহী শকটগুলি পশ্চাতে রেখে সৈন্যবাহিনীকে অগ্রভাগে সাজিয়ে দেয় একান্ত সচীব ভাস্কর সিংহ। রথ ছেড়ে অশ্বারূঢ় হলেন রাজা নৃসিংহদেব। দ্রুত প্রদ্যুম্নপুর অভিমুখে যাত্রা করে সহস্র সৈনিক। সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে।

—জয় মহারাজ নৃসিংহদেবের জয়।

অশ্বক্ষুরধ্বনিতে, জয়নাদে মুখরিত হয় গ্রামবসত। দলে দলে জনপদবাসী ছুটে চলে প্রদ্যুম্নপুর রাজপ্রাসাদ দুর্গাভিমুখে। দক্ষিণে বামে অযুত জনধারা অব্যাহত হয়। তারা জয়ধ্বনি দেয়।

—জয় মহারাজ নৃসিংহদেবের জয়।

এই দিন প্রদ্যুম্নপুর দুর্গফটকের অভ্যন্তরে সূর্য যখন পূর্ব দিগন্ত থেকে ধীরে ধীরে মাথার উপর উঠে এলো, তখন দুর্গবাসী সমস্ত রক্ষী, সৈনিক তৃষ্ণায় আর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছিল। কিন্তু উপায় নেই। প্রাসাদ সংলগ্ন কালাই সায়রে তৃষ্ণার জল আহরণ করতে হলে দুর্গফটক খুলতেই হবে এবং ফটকের বহিঃদেশে যমদূতের মত প্রহরায় রয়েছে যোতবিহারের সৈন্য।

মনে মনে প্রমাদ গুণছিল কংসারীও। সে ভাবতে পারে নি এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ ঘটতে পারে। সাধারণ নগরবাসী এমনভাবে মিলিত হতে পারে সৈনিকদের সঙ্গে। মহীরামকে নিয়ে ঘন ঘন আলোচনায় বসছিল কংসারী; এই পরিকল্পনা কি করে বিশ্বাসযোগ্য পথে ঘুরিয়ে নেওয়া যায়। কেননা নিশ্চিত ছিল কংসারী, রাজকুলোদ্ভব না হলে সিংহাসনের দাবী করলেই সমস্ত

স্বপক্ষীয় ব্যক্তিগণও বিরুদ্ধাচরণ করবে। রাজকুমারী চন্দ্রকে যেভাবে হোক লাভ করতেই হবে সর্বাগ্রে। তারপর প্রদ্যুম্নপুরের সিংহাসনে আরোহণ করা দুঃসাধ্য হবে না। অতএব।

সূর্য তখন মাথার উপর। দুর্গাভ্যন্তরে সৈনিক ও রক্ষীদের শক্তি যখন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। তৃষ্ণায় তাদের দেহমন যখন ভেঙে পড়তে চাইল ঠিক সেই সময়ে তারা উৎকর্ণ হয়ে মহারাজ নৃসিংহদেবের জয়ধ্বনি শুনতে পেল। দুর্গফটকের প্রাকারশ্রেণীর উপর থেকে তারা দেখল বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সহস্র সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে মহারাজ নৃসিংহদেব প্রাসাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন।

সংবাদ তরঙ্গিত হতেই সেনাপতি কংসারী দুর্গ তোরণে নাকড়া বাজিয়ে দেবার আদেশ দিয়ে দুর্গফটক উন্মুক্ত করে মহারাজ নৃসিংহদেবকে সসম্মানে আহ্বান করবার জন্য ত্বরিত পদে অগ্রসর হল।

বিপুল উল্লাসে বিনা বাধায় রাজ সৈন্যগণ দুর্গফটক অতিক্রম করল। ভাস্কর সিংহ দরবারের সম্মুখে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর বিস্মিত বর্ণ বিদারিত করে প্রাসাদ রক্ষীগণ সমস্বরে জয়ধ্বনি দিল।

—জয় মহারাজ নৃসিংহদেবের জয়।

কৃতাঞ্জলীপুটে রাজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কংসারী। রাজা নৃসিংহদেবের দৃষ্টি তীব্র হয়ে ওঠে। মনের সন্দেহ বিন্দুমাত্র অপসারিত হয় নি। লৌহকঠিন কণ্ঠে বলেন।—তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে সেনাপতি কংসারী।

কংসারী ঘুরে দাঁড়ায়। সূর্যালোকে তার চোখের তারা চক্ চক্ করে ওঠে। বলে।

—কৈফিয়ৎ, হ্যাঁ দেব বৈকি মহারাজ, এতজন রাজপুরুষকে বন্দী করেছি কৈফিয়ৎ দিতে হবে বৈকি!—কংসারীর ক্রূর চোখের পাতার নীচে জিঘাংসা কাঁপে।

—এই কে আছিস? বজ্রনির্ঘোষিত রাজার কণ্ঠস্বর।

একজন রক্ষী ছুটে এসে অভিবাদন করে দাঁড়ায়।

—কারারক্ষী।—রাজাদেশ প্রাপ্তিমাত্র কারারক্ষীকে আহ্বান করতে ছুটে যায় বার্তাবাহী।

কারারক্ষী আসে। অভিবাদন করে দাঁড়ায়।

—সমস্ত বন্দীদের মুক্ত কর।—রাজার কৌতূহলী দৃষ্টি তখনও সেনাপতির মুখের উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে।

—কিন্তু মহারাজ।—কিছু বলতে চায় কংসারী।

কৌতূহল সমস্ত দুর্গরক্ষীদের চোখে। তারা বুঝতে পারে না কে শত্রু, কে

মিত্র। তবে দুশ্চিন্তা করে না তারা কারণ রাজার উপস্থিতি ওদের দুশ্চিন্তা হরণ করেছে।

মুক্ত হয় সকল বন্দী।

ধিক্কৃত হয় সেনাপতি কংসারী।

প্রদ্যুম্নপুর রাজপ্রাসাদের শিখর কেতনের উড্ডীয়মান প্রকম্পনের দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হয়ে ওঠে পুরবাসীর অতন্দ্র নয়ন।

বহুদিন পর নিজ শয়নকক্ষের মধ্যে দাঁড়িয়ে চন্দ্রকুমারীর দুই ব্যথিত নয়নের কোণে মধুর অশ্রুবিন্দু আবার ফুটে ওঠে। নক্ষত্র জাগে আকাশে। নিশীথবায়ুর চুম্বনে তন্দ্রাভিভূতা চন্দ্রকুমারীর দুই স্বপ্নিল চোখ। কল্পনায় রঘুনাথের বাহু-বন্ধন বরণ করে নিয়ে পুষ্পিত হতে চায় যৌবনের উৎসর্গ।

দুর্গফটকে যামঘোষী ঘণ্টাধ্বনি তরঙ্গিত হয় যথা নিয়মে।

কালচক্রে ধাবিত হয় দিন। যোতবিহারের পাষাণ প্রাসাদে তরুণ রঘুনাথের নয়নের হর্ষ অকস্মাৎ এক নিবিড় বিষাদে মন্থর হয়ে ওঠে। কিন্তু কেন? চঞ্চলিত চিত্তের সব প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠেন তিনি। কিন্তু উত্তর পান না। শুধু শারদ নভঃপটের অভ্রমালার উৎসবের হর্ষ, কানন কিংশুকের রক্তিম শিখা বসন্ত দিনের সুষমায় মধুর করে দিয়ে যায় হৃদয়।

সন্ধ্যাগমে উৎফুল্ল জ্যোৎস্নালোকে প্লাবিত প্রান্তরের বিস্তৃতির দিকে তাকিয়ে রস-সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে তাঁর মন।

ভরা বসন্ত।

প্রাসাদ কক্ষে দীপাধারে জ্বলে তৈল দীপ।

সোম-সুরার মত তীব্র জ্বালা জ্বলে শিরায়। বাতায়ন পথে বাইরের দিকে তাকান রঘুনাথ। প্রাঙ্গণের বুকে জ্যোৎস্নার মায়া। রুপালী কুহেলীর জালায়ন। সঙ্গোপনে শোণিতে জাগে জোয়ার, ধমনীতে জাগে আগুন। উদ্যোগ নেই, আয়োজন নেই, কেবল এক অন্তহীন ঔদাসীন্য। ধীরে ধীরে অলিন্দ অতিক্রম করে রাজপ্রাসাদের বাইরে এসে দাঁড়ালেন রঘুনাথ।

দেখলেন প্রণয়িণী অপ্সরার মত জ্যোৎস্নালোকে আপ্লুত হয়ে উঠেছে সারা যোতবিহার। মন্দিরের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন রঘুনাথ। বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, যেন চিরবিকারহীন দেবতার তেমনি নির্বিকার ঔদাস্য। চলমান জগতের কোন তরঙ্গ সে ঔদাস্যের কুল ছুঁয়ে যায় না। রাজোদ্যানের পথরেখার উপর এসে দাঁড়ান তিনি। পুষ্পিত দ্রুমবাহু চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে। চমকিত নেত্রে পুষ্পিতা অতসীকুঞ্জের দিকে সিক্ত দৃষ্টি তুলে হৃদয়ের চাঞ্চল্য মুক্ত করে দিতে চান রঘুনাথ; কিন্তু পারেন না। একাকী সেই জ্যোৎস্নামোদিত কাননে

মৃদুলানিলের স্পর্শ গায়ে মেখে পদ সঞ্চালন করেন রঘুনাথ ; কিন্তু প্রেমবিচলিত কামনার জ্বালা সে স্পর্শে প্রশমিত হয় না।

কানন প্রান্তের নিভৃত হতে প্রাসাদেই ফিরে এলেন রঘুনাথ।

—দৌবারিক।

রাজার আহ্বানে ছুটে আসে দৌবারিক।

—নাচ মহল খুলে দে।

নাচ মহলের নিদ্রা ভেঙে যায়। স্ফুরিত লাস্যে ঝটিকার মত মত্ত হয়ে ওঠে রাজনটী। রাজার যৌবনমদায়িত হাত থেকে পুষ্পমাল্য তুলে নিয়ে কবরীতে ধারণ করে রাজনটী। তার ক্ষুধার্ত কামনার নিঃশ্বসন্ত আর্তি রাজার বাহুবন্ধনে লুটিয়ে পড়তে চায়।

নিভৃত নাচমহলে দীপশিখা স্থির হয়ে রয়েছে।

বিহ্বল হয়ে রয়েছে রাত্রি।

আবেদনের স্বরে আকুল হয়ে রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে রাজনটী।

—সাহস হয় না রাজা।

চির নির্বিকারের মত, চির উদাসের মত, চিরব্যঞ্জনাবিহীন মুখে গভীর কামনার একটা চাপা আবেগ রাজার দুই ওষ্ঠে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

—কিসের সাহস ?

বেণুযষ্টির মত লঘু শরীরশোভা বিস্তার করে ধীরে ধীরে রাজার কাছে এগিয়ে আসে রাজনটী। তার নৃত্য শ্রম-ক্লান্ত দেহে বুঝি জয়ের মহিমা। বাঁকা চাঁদের মত হাতখানি তুলে রাজার কাঁধে রাখে রাজনটী। ধীরে ধীরে রাজার অনাবৃত বাহুমূলে স্পর্শ বুলিয়ে দেয়।

স্পর্শ যে পথে যায় সে পথে আগুন ছড়িয়ে বলে মদালসা নারী।

—রাজা, রক্তের আহ্বান যখন অন্তরে ধ্বনিত হয় তখন অন্যকারো উপস্থিতি সহ্য হয় না। যদি অনুমতি হয় তবে প্রদীপ নিভিয়ে দিই ?—কাঁচুলী বাঁধা বেণুযষ্টির মত দেহ ভঙ্গিত করে প্রদীপ নিভিয়ে দিতে যায় রাজনটী।

—দাঁড়াও।—সহসা রাজার কণ্ঠস্বর যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

—রূপাতিশালিনী নটী, নিভিও না প্রদীপ।

রাজাদেশে মুহূর্তে শ্রবয়িতার সকল আবেগ স্তব্ধ হয়ে যায়। ছলপ্রণয়ের লীলা অসমাপ্ত রেখেই নাচ মহল থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলেন রাজা রঘুনাথ। প্রাসাদ অলিন্দ দিয়ে হেঁটে শয়ন কক্ষের দিকে চলে গেলেন। আভূমি নত হয়ে অভিবাদন করে নৈশ প্রহরীর দল।

অলিন্দ অতিক্রম করে শয়ন কক্ষের দিকে ফিরতেই দ্বারপ্রান্তে শঙ্খধবল পাষাণ প্রাচীরের এক মাধবী লতিকার পুষ্পিত স্তবক রাজার মস্তক স্পর্শ করে গন্ধবিধুর

চুম্বন দান করে লুটিয়ে পড়ল। মৃদু বায়ুভারে আন্দোলিত পুষ্পিত সেই লতাস্তবক দুই হাতে তুলে ধরলেন রঘুনাথ।

মনে হল শুচিতানিষ্ঠ বিহ্বল ব্রততীর প্রতিটি পত্রের বুকের উপর এক প্রণয়োৎসারিত কুঙ্কুমিত চুম্বন অঙ্কিত রয়েছে!

শয়ন কক্ষে চলে গেলেন রাজা রঘুনাথ। বুঝতে পারলেন রঘুনাথ, বিশ্বাস করলেন; তাঁর হৃদয়ের প্রিয়াহীন শূন্যতা; গোপনচারিণী এক ছায়ামূর্তির রক্তাক্ত চুম্বনে সদাই শোণিম হয়ে রয়েছে।

কিন্তু কে সে?

মনে মনে আর্তনাদ করে ওঠেন রঘুনাথ।

কোথায় সে?

ধীরে ধীরে বিষণ্ণ বিনম্র এক তন্দ্রার মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন রঘুনাথ।

এদিকে—

প্রদ্যুম্নপুর রাজপ্রাসাদে শয়ন কক্ষের বাতায়নে দাঁড়িয়ে ছিল রাজকুমারী চন্দ্র। মন্থর বিনিদ্র প্রহর। বাতায়নে ঝুঁকে প'ড়ে বাইরে দৃষ্টি মেলে দেয় চন্দ্রকুমারী।

রাজোদ্যানে পুষ্পিত কাঞ্চন, চম্পকের সঞ্চরমানা ছায়া। প্রেমাপ্লুতা নয়নে তাকিয়ে থাকে চন্দ্রকুমারী। বৃক্ষরাজির উপরে চন্দ্রালোকের জ্যোতির্ময় বিস্তার। গগনপটের পাণ্ডুর নীলশ্রীর বুকে তারার দল মহাসমারোহে প্রস্ফুটিত। এক অদ্ভুত তৃষ্ণা বুকে নিয়ে এই বাতায়নে দাঁড়িয়ে থাকে রাজকুমারী, তার অনুভবের জগতে যেন বহুদিনের বন্ধনে আবদ্ধ এক ঝঞ্ঝা-সমীর হঠাৎ পথ খোলা পেয়ে উদ্বেল হয়ে উঠতে চায়, বুকের অনুচ্চার কামনা উচ্চারিত হ'য়ে তরঙ্গিত রক্তস্রোতে সুগঠিত শরীরের নিটোলতায় বাঞ্ছিতের একটি উৎসুক চুম্বনের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। ইচ্ছা হয় এই বিপুল পিপাসিত অধরের উপর একটি প্রজ্বলন্ত ওষ্ঠের স্পর্শ পড়ুক, প্রবল বিলম্বিত চুম্বনের রুদ্ধ দশন সরক্ত চুম্বন এঁকে দিক।

আর বাতায়নে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না চন্দ্রকুমারী। স্বেদাক্ত দেহে কেতকী-বাসিত শয্যার উপর ছুটে এসে লুটিয়ে পড়ে।

রাত্রি গভীর।

পূর্ণ নীরবতা ছিন্ন ক'রে যাম ঘোষণা ক'রে দুর্গ ফটকে ঘণ্টাধ্বনি বাজে।

প্রদ্যুম্নপুরের রাজ অন্তঃপুর যেন রূপার কাঠির স্পর্শে নিশ্চেতন। কিংকরীরা সুপ্তিমগ্ন, প্রতিহারিণী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। অলিন্দে সারিবদ্ধ স্তম্ভ-গাত্রের দীপাধারে তখনো স্তিমিত আলোক জ্বলছে।

রাজার শয়ন কক্ষে ঘৃতদীপের শিখা অতি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সেই মৃদু

আলোকে স্বর্ণ-পর্যঙ্কে আধো ঘুম আধো জাগরণের এক মিশ্র সৌরভে আবিষ্ট ছিলেন রাজা নৃসিংহদেব। নিদ্রাতুরা রাণী সনকার মৃদুল হাতের কবোষ্ণ নিটোল মমতাভরা স্পর্শ রাজার অনাবৃত বক্ষে, চেতন অথচ অনায়ত্বধীন চেতনার মধ্যে দূর সন্ধানী আলোকরশ্মির মত এক অবচেতন অনুভূতি জাগায়। অনুভব করেন তিনি, যেন এক অসিতানয়ন শোভা অশ্রুসজল মেদুরতায় তাঁর অনাবৃত বক্ষের উপর লুটিয়ে রয়েছে। একটি কচি কোমল ভীরুস্বর কাকুতির মত মর্মরিত হ'য়ে কেঁপে কেঁপে দুলে দুলে তাঁর পায়ের কাছ থেকে ঊর্ধ্বে উঠে বুকের মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে। হৃদয়ের স্নিগ্ধ সলিলে সিক্ত সেই স্বপ্নকুসুমকে বক্ষলগ্ন ক'রে সেই স্বর শুনতে পান নৃসিংহদেব।

—"শয়নকক্ষের গবাক্ষপথে বারেকের জন্য তাঁকে দেখেছিলাম পিতা।" চমকে ওঠেন রাজা নৃসিংহদেব। তন্দ্রাভঙ্গে বুঝতে পারেন, রাণী সনকার পরিণত যৌবন প্রশান্ত নির্ভরতায় তাঁর দুই বাহুর মধ্যে আবদ্ধ র'য়েছে।

শয্যা ছেড়ে উঠে পড়লেন রাজা নৃসিংহদেব। ঘৃতদীপ নিভিয়ে দিলেন।

রাত্রির অলস দেহে জীবনের স্ফুলিঙ্গ উঠছে। বাতায়নের মধ্য দিয়ে দেখা দেয় প্রভাতী আলো। তরুশীর্ষে লাগে নীলাভ সোনালী অরুণ-কিরণ-লেখা।

তখন রৌদ্র-তাম্রান্বিত বর্ণে সূর্যাস্তের রাগ লেগেছে। ব্যস্ততা লেগেছে যোতবিহারের রাজপ্রাসাদে। দূতমুখে অকস্মাৎ মহারাজ নৃসিংহদেবের আগমন-বার্তা জ্ঞাত হয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সবাই। সূর্যাস্তের সোনা গায়ে মেখে প্রাসাদ সংলগ্ন চত্বরে প্রাসাদরক্ষীদল ও প্রধান রাজ পুরুষগণ অপেক্ষা করছে। প্রান্তর পথের উপর দিয়ে শুভ্র রথ-কেতনে প্রতীচীর অরুণিত ললাটের স্পর্শ বহন ক'রে রাজাগমন সূচিত হয়।

মহারাজা নৃসিংহদেবের পদরেণু-পূত স্পর্শের পুলক যোতবিহারের রাজপ্রাসাদে সঞ্চালিত হয়। বিপুল জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে প্রাসাদে প্রবেশ করেন রাজা নৃসিংহদেব, আভূমি নত হয়ে অভিবাদন করে রক্ষীদল।

সন্ত্রস্ত পদে এগিয়ে এসে রাজার পদস্পর্শ করে প্রণাম করে সাগ্রহ চক্ষুর দৃষ্টি তুলে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুনাথ।

—কি প্রয়োজনে পথ শ্রম সহ্য করে এলেন পিতা?

মন্ত্রণাকক্ষের রাজাসনে ধীরে উপবেশন করেন রাজা নৃসিংহদেব। দুই চক্ষের স্নেহার্দ্র দৃষ্টি রঘুনাথের মুখের উপর নিবদ্ধ ক'রে বলেন।

—এক বিশেষ প্রস্তাব নিয়ে তোমার কাছে এসেছি পুত্র।

—আমার কাছে? প্রশ্নাকুল দৃষ্টি তুলে শুধু নীরবে তাকিয়ে থাকেন রঘুনাথ।

—হ্যাঁ পুত্র তোমার কাছে।

—আদেশ করুন পিতা। ঈষৎ শিহরিত-ভ্রূকুটি সংযত করেন রঘুনাথ।

—আদেশ নয় পুত্র অনুরোধ। একটি বিশেষ অনুরোধ নিয়ে এসেছি তোমার কাছে।

তখন অপরাহ্নের সূর্য অস্তাচলে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। ঘৃতদীপের স্নিগ্ধ রশ্মিসম্পাতে ক্ষণতরে আর্ত হয়ে যায় মহারাজ নৃসিংহদেবের বক্ষের স্পন্দন। দেবোপমকান্তি বিশাল দুটি চক্ষু তুলে আবার বলেন রাজা নৃসিংহদেব।

—তোমার সঙ্গে আমার একমাত্র আদরিণী কন্যা চন্দ্রকুমারীর বিবাহ দিতে চাই রঘুনাথ।

—পিতা! মুহূর্তে এক তপ্ত মরুধূলির ঝঞ্ঝা ছুটে এসে রঘুনাথের বুকের মধ্যে প্রবেশ করে।

বহুদূর সন্ধানী আলোকরশ্মির মত আশ্চর্য দৃষ্টি মেলে বাতায়ন পথে বাইরের দিকে তাকান রঘুনাথ, ছিন্নমেঘ আকাশের শশীলেখার মত এক হরিদ্রাভ দেওদার পত্র বক্ষে কুঙ্কুমিত অধরস্পর্শ নিয়ে চিরপ্রণয়ের অভিলাষে রঘুনাথের হৃদয়ের চারিপার্শ্বে ভেসে বেড়ায়। অনুভব করেন রঘুনাথ তাঁর হৃদয় এক অত্যাশ্চর্য প্রাণের আহ্বানে আহূত হয়ে রয়েছে।

রাজা নৃসিংহদেব নিষ্পলক নয়নে রঘুনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রঘুনাথের ভাবান্তর লক্ষ করেন। বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন।

—তোমার এই ভাবান্তরের অর্থ কি পুত্র?

রঘুনাথের দুই চক্ষু অকস্মাৎ বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে, মনের দুঃসহ যাতনা সংযত করে ধীর কণ্ঠে বলেন রঘুনাথ।

—তুচ্ছ রঘুনাথকে ক্ষমা করুন পিতা। এই একটি ক্ষেত্রে আমি নিরুপায়। আমি বাগদত্ত।

নিষ্পলক নেত্রে রঘুনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন তাঁর অপমানিত আকাঙ্ক্ষার জ্বালা সহ্য করতে চেষ্টা করেন মহারাজ নৃসিংহদেব।

শুষ্ক ও কঠোর অথচ ব্যথিত দৃষ্টি তুলে বলেন।

—মনে রেখো রঘুনাথ তোমাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে আমি এই সিংহাসন দান করেছি। বিশ্বাস ছিল, আমার কোন আদেশ তুমি অমান্য করবে না। কিন্তু ধর্ম বর্জন করে তোমার কোন দুরাশা সফল হবে না।

উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজা নৃসিংহদেবের কণ্ঠস্বর। উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

—একদিন সময় দিলাম। তোমার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে যোতবিহারের সিংহাসনের অধিকার তোমার থাকবে কি না।

দৃষ্টি নত করে দ্রুত প্রাসাদ ছেড়ে পথের উপর এসে দাঁড়ান রাজা নৃসিংহদেব।

রথে উঠতে গিয়ে আদরিণী বন্যার অশ্রুসজল মুখখানি মনে পড়ে যায়। বাষ্পাকুল হয়ে সুগভীর বেদনায় অশান্ত হয় পিতৃ হৃদয়। রথারূঢ় হলেন না। দ্রুত রথ থেকে একটি অশ্ব খুলে নিয়ে পরমুহূর্তে অশ্বারূঢ় হয়ে প্রান্তররেখা লক্ষ করে ছুটে চলে যান।

ধীরে যোতবিহারের পাষাণ প্রাসাদের বাইরে এসে দাঁড়ান রঘুনাথ। তাঁর দুই চোখে কোন স্বপ্নের ঘোর, সম্মোহিতের কোন ছায়া নেই। স্বচ্ছ দুই স্বপ্নালু আঁখিপটে রয়েছে শুধু গভীর অনুরাগ, ব্যাকুল নির্ভরতা আর সাগ্রহ আত্মসমর্পন।

এদিকে—

প্রদ্যুম্নপুরে রাজমন্দিরে সান্ধ্য প্রার্থনাগীতে মুখরিত মন্দির প্রাঙ্গণে রুদ্র-ঝঞ্ঝার মত তীব্র বেগে অশ্বচালনা করে প্রবেশ করলেন রাজা নৃসিংহদেব। রবরোষিত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—

—বন্ধ কর আরত্রিক।

মন্দিরাভ্যন্তর থেকে বিস্মিত আচার্য অর্কদেব ছুটে এলেন। অশ্বারূঢ় চঞ্চল রাজা নৃসিংহদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

—কি বলছ রাজা?

—বন্ধ কর পূজা। চিৎকার করে উঠলেন রাজা। তাঁর সমস্ত মুখমণ্ডলে যেন অমমতার আশীবিষ। অশ্ব ছুটিয়ে দুর্গ ফটকের দিকে চলে গেলেন। তাঁর অশান্ত দাবানলতাড়িত হৃদয়ের অষ্টৈর্যে বিমর্ষ ও বিস্মিত হল পুরবাসী। বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করে দারুবেদিকায় শয়ন করলেন তিনি। অন্তঃপুরে গেলেন না। ধীরে ধীরে প্রহর অতিক্রান্ত হয়। সুকঠিন পাষাণ বিগ্রহের মত অবিচল মূর্তি নিয়ে বিশ্রামকক্ষেই অবস্থান করেন রাজা নৃসিংহদেব।

রাত্রি গভীর হয়ে আসে।

তখন ভোর হয়ে গিয়েছে।

সকলেই তাকিয়ে দেখলো, বংসারী এসে দাঁড়িয়েছে। সেই নাতিদীর্ঘ সাধারণ দেহ; কেবল ক্রূর মুখাবয়ব থেকে দুটি জলন্ত চক্ষের জ্বালা বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

আচার্য অর্কদেব তার দিকে তাকালেন আর একবার সকলের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন।

মহামন্ত্রী তাঁর চিন্তান্বিত চক্ষু তুলে প্রশ্ন করলেন।

—আপনারা রাজার এইরূপ আচরণের কোন কারণ অনুধাবন করেছেন কি?

প্রদ্যুম্নপুরের প্রধান পুরোহিত আচার্য অর্কদেবের গৃহে সমবেত রাজপুরুষগণ মহামন্ত্রীর এই প্রশ্নে মৃদুস্বরে আলোচনায় রত হলেন।

সেনাপতি কংসারীর মুখভাবের কোন পরিবর্তন দেখা দিল না। চওড়া চোয়াল দুইটি একটু শক্ত হয়ে উঠল মাত্র।

ধীরে ধীরে চিন্তান্বিত মস্তক আন্দোলিত করে আচার্য অর্কদেব বললেন।

—পূজা বন্ধের আদেশ শুনে আমি প্রথমে বিস্মিত হয়েছিলাম। মনে করেছিলাম হয়তো কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে থাকবে। কিন্তু·· ···

কিন্তু ? সমবেত জিজ্ঞাসা উৎকণ্ঠায় উৎসুক।

—আজ প্রত্যূষে এক দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে ফিরে এসেছি। আমি উদ্বিগ্ন।

—আপনার উদ্বেগের কারণ কি আচার্য ?

শান্ত বিনীত স্বরেই প্রশ্ন করে কংসারী।

তবু মহামন্ত্রীর মনে হয় যেন একটা চাপা দম্ভ, একটা অনুক্ত তাচ্ছিল্য লুকিয়ে রয়েছে তার কথাগুলির মধ্যে।

—রাজা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি। বৃথা প্রতীক্ষা সহ্য করে ফিরে এসেছি। তাই মন্দিরে নিত্য পূজা রাজাদেশ উপেক্ষা করেই করতে হয়েছে।

চিন্তিত ও বিমর্ষ শোনায় অর্কদেবের কণ্ঠস্বর।

—দেশের মঙ্গলের জন্য আপনি উপযুক্ত কাজই করেছেন আচার্য। রাজাদেশে দেবপূজা বন্ধ হতে পারে না।

কংসারীর কণ্ঠস্বরে রাজার উদ্দেশ্যে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার ধ্বনিত হল যেন।

অর্কদেব নীরবে মাথা নাড়লেন।

সংশয়ের ছায়া ঘনায়মান হল অনেকের মুখমণ্ডলেই।

অস্থির হয় সকলেই।

অকারণ এখানে অর্কদেবের গৃহের নিভৃতে কালক্ষেপ না করে মহারাজ নৃসিংহদেবের সন্নিধানে গমন করাই স্থির করলেন সকলে।

ঠিক সেই সময়ে।

যোতবিহার থেকে মহারাজ নৃসিংহদেবের সম্মুখে নত মস্তকে এসে দাঁড়ায় যোতবিহারী দূত।

চমকে উঠলেন রাজা নৃসিংহদেব। যে নির্মম কল্পনার সঙ্গে মনের গোপনে যুদ্ধ করছিলেন তিনি বিগত বিনিদ্র রাত্রি ধরে, তিনি কি তাই শুনতে পাবেন ? শঙ্কিত হয় তাঁর মন। আশঙ্কায় বেদনাপন্ন হন তিনি তবু উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চান দূতবার্তা।

—কি সংবাদ দূত।

—মহারাজ, রাজা রঘুনাথ যোতবিহারের সিংহাসন ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন।

—চলে গিয়েছেন ? কি এক গূঢ় বেদনায় বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে মহারাজ

নৃসিংহদেব দূতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। পরক্ষণেই রাজকীয় সমারোহ-রিক্ত হৃদয়ে দরবার কক্ষ ছেড়ে চলে যান।

কিছুক্ষণেই মধ্যেই আচার্য অর্কদেবসহ রাজকর্মচারীগণ ও সেনাপতি কংসারী রাজার দর্শনলাভের জন্য দরবারে এসে উপস্থিত হলেন।

কিন্তু রাজার সঙ্গে দেখা হল না।

মহারাজ নৃসিংহদেব কারও সঙ্গে দেখা করলেন না।

বিমর্ষ এবং হতবাক হয়ে ফিরে গেলেন দর্শনপ্রার্থীগণ।

বিশ্রামাগারে একাকী বসে রইলেন রাজা নৃসিংহদেব।

বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে বিচূর্ণ পোতের ছোট বড় অংশগুলির উপর যেমন প্রজ্বলন্ত সূর্যালোক ছড়িয়ে পড়ে, রাজার আকাঙ্ক্ষার ভগ্ন অংশগুলির উপর ঠিক তেমনি এক অশান্ত মনের স্পর্শ তাঁকে সমস্ত জগৎ থেকে টেনে এনে রিক্ত ক'রে তুলেছে। নিজেকে তাই সমস্ত পর্যায় থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে একাকিত্বের আলিঙ্গনে সান্ত্বনার সন্ধান করতে চাইলেন রাজা নৃসিংহদেব। কিন্তু বুঝতে পারেন নি তাঁর এই নৈরাশ্যের অন্ধকারটুকু অবলম্বন ক'রে কি নিদারুণ বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে পায়ে পায়ে।

সেদিন প্রদ্যুম্নপুরের রাজ্যসীমায় তাম্রাভ উঁচু নীচু প্রান্তরের আলোক মুছে আঁধার নামল।

দুর্গপ্রাসাদে যথারীতি জ্বলে জ্বলে উঠলো রাত্রির আলোক। কোথাও কোন ব্যতিক্রম নেই। কেবল রাজসেনাপতি কংসারীর সতর্ক চোখের সন্ধানী দৃষ্টি প্রাসাদের চতুর্দিকে ঘুরে ফেরে।

তখন অনেক রাত।

নিশ্চেতন রাজপ্রাসাদে নিদ্রাহীন একজোড়া শুকসারী পিঞ্জরে পাখা ঝাপটায়। নিজ অনুচরদের নিয়ে নিঃশব্দে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে বিশ্রামাগারের সম্মুখে দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায় কংসারী। স্তম্ভগাত্রের দীপাধারের রক্তিম আভায় তাদের হাতের মুক্ত অসি ঝলসিত হয়ে উঠলো লেলিহ জিহ্বার মত। শ্বাপদের মত বন্য-হিংসায় দ্বার উন্মুক্ত করে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে কংসারী। এক লহমার জন্য হতচকিত হয়ে গেলেন রাজা নৃসিংহদেব, পর মুহূর্তেই বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়াতেই দেখলেন দ্বার দিয়ে প্রায়ান্ধকার অলিন্দ অতিক্রম করে কংসারীর অনুগামীগণ মুক্ত খঞ্জর হাতে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। নিরস্ত্র নিরুপায় রাজা নৃসিংহদেব নিজ প্রাসাদে কংসারীর হাতে বন্দী হয়ে সেই রাত্রিতেই কারাগারে আবদ্ধ হলেন।

পরদিন।

নিশাবসানের বিহগকাকলির সঙ্গে প্রদ্যুম্নপুরবাসী রাজভেরী শুনতে পেয়ে গৃহ ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়ে ঘোষকের বিলম্বিত সুরে শুনতে পেল সেই ঘোষণা—"প্রদ্যুম্নপুরের মহারাজা রাজসেনাপতি কংসারীর সঙ্গে নিজ অনূঢ়া কন্যা চন্দ্রকুমারীর বিবাহ স্থির করে রাজকার্য চালনার ভার কংসারীর উপর ন্যস্ত করেছেন।" বিস্মিত রাজ্যবাসী দেখল একদল সৈন্য অশ্বারূঢ় হয়ে ছুটে গেল যোতবিহারের দিকে। তাদের মধ্যে একজন অশ্বারোহী মহীরাম। তার ডান হাতে মুক্ত তরবারি, বাম হাতে অশ্ববল্গা। অন্যেরাও সশস্ত্র। ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে সূর্যকরনিকর। শিষ্ট প্রতিপালক রাজা নৃসিংহদেবের এতাদৃশ সিদ্ধান্তে বিস্মিত হলেন মহামন্ত্রী, আচার্য অর্কদেব এবং অন্যান্য রাজপুরুষগণ।

বিস্মিত হলেন সকলেই।

কিন্তু ঘটনার রহস্য জানতে পারলেন না। রাজপ্রাসাদে কেউ প্রবেশের নিষেধ অতিক্রম করতে পারলেন না।

রাজপ্রাসাদের দুর্গফটক থেকে ফিরে এলেন ভাস্কর। বিষণ্ণ হতাশা ও বেদনাভিভূত তিনি। জীবনের এক স্বপ্নভঙ্গের আশঙ্কায় অভিভূত ভাস্করের বিশালতৃষ্ণ চক্ষু এই মুহূর্তে রঘুনাথকে খুঁজে বেড়ায়। দ্রুত অশ্বচালনা করে যোতবিহারে পৌঁছে রঘুনাথের রাজ্য ত্যাগ ও তার কারণ অবগত হলেন ভাস্কর সিংহ, দেখলেন সমস্ত রাজপ্রাসাদ জুড়ে সেনাপতি প্রেরিত সৈনিকগণ ইতঃস্তত চলাফেরা করছে।

ব্যাকুল হৃদয় ভাস্কর সিংহ ছুটে যান। চতুর্দিকে অন্বেষণ করেন তিনি। লাউগ্রাম যান। কিন্তু রঘুনাথ নেই।

অবশেষে অপরাহ্ন বেলায়। গ্রামান্তের বিসর্পিত অরণ্যানীর নিভৃতে অঙ্গদ রায়ের সঙ্গে বহুকষ্টে সাক্ষাৎ করলেন ভাস্কর সিংহ। অবগত হলেন সেনাপতি কংসারীর প্রেরিত একটি সৈন্যদল মহীরামের নেতৃত্বে রঘুনাথের অনুসন্ধান করে ফিরছে। সর্বত্র পাতি পাতি অনুসন্ধান চালাচ্ছে তারা গোপনে, নিঃশব্দে।

বনপ্রদেশে একাকী আত্মগোপন করেছেন রঘুনাথ।

প্রয়োজনমত তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা অসম্ভব হবে না। নিজেদের মনকে প্রশ্ন ক'রে কোন রকম আলো আবিষ্কার করতে পারলেন না ভাস্কর সিংহ ও অঙ্গদ রায়। কিন্তু রাজপ্রাসাদের পরিস্থিতি জানার আগ্রহে চঞ্চল হয়ে উঠলেন ভাস্কর সিংহ। সংবাদ চাই। প্রকৃত সংবাদ। রাজা নৃসিংহদেবের রাজকন্যাকে পাত্রস্থ করার এই আগ্রহ কতদূর সত্য জানা চাই। তীব্র কৌতূহলে বিচলিত ভাস্কর সিংহ অঙ্গদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে যান।

অনুভব করে অগাধ অরণ্যের এই শোভাময় রূপের কোথায় যেন শূন্যতা, কিসের যেন অভাব তার মনকে নিঃশঙ্ক নিরুদ্বেগ হতে দিচ্ছে না।

রাত্রি গভীর। স্বচ্ছ আঁধারে আবৃত প্রদ্যুম্নপুর রাজোদ্যান। আকাশে এক ফালি ক্ষুদ্র চন্দ্রকলা মাঝে মাঝে মেঘমুক্ত হয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারছে। নিথর উদ্যান। নিথর বিশ্বচরাচর।

নিষ্পলক চোখে রাজপ্রাসাদের একটি বিশেষ কক্ষের দিকে চেয়ে আছেন ভাস্কর। অন্যমনস্ক গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন তাঁর মন। শাণিত সায়কের মত ঝকঝক করছে তাঁর চোখের দৃষ্টি।

ওদিকে প্রাসাদ অভ্যন্তরে,—

এক মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল প্রহরী। পরক্ষণেই অভিবাদন করে বলল—

—মহারাণী আপনি ?

—কোন জবাব না দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন রাণী সনকা।

সসম্ভ্রমে বলে প্রহরী।

—বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ মহারাণী। মহামান্য সেনাপতির আদেশ।

কঠিন স্বরে আদেশ করেন রাণী সনকা—

—পথ ছাড়।

—ক্ষমা করুন।

চিৎকার করে উঠলেন রাণী।

—আমার আদেশ পথ ছাড়।

—ক্ষমা করুন আমি নিরুপায়।

নিরুপায় হয়েই শয়ন কক্ষে ফিরে এলেন রাণী সনকা।

কন্যা চন্দ্রকুমারী ও প্রমদার বিস্ময়-নিবিড় অপলক দৃষ্টির সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

—মা, পিতার কোন সংবাদ ? চন্দ্রকুমারীর কণ্ঠস্বর তীব্র আর্তনাদের মত বেজে ওঠে।

প্রমদার দুই নয়নের পক্ষ্মপল্লবে শীত সন্ধ্যার বেদনা-শিশির সঞ্চারিত হয়।

শান্ত হও, ধৈর্য হারিও না। মনে হচ্ছে আমরা সবাই বন্দী।

—বন্দী !

—হ্যাঁ, আর সে সংবাদ প্রাসাদের বাইরে গোপন রয়েছে।

—তাই যদি হয় তবে শত্রু পরিবৃতা হয়ে প্রহরা অতিক্রম করে আমরা কি সেই সংবাদ বাইরে পেঁছাতে পারব ? করতলে মুখমণ্ডল নিবদ্ধ করে শয্যার উপর বসে পড়ে চন্দ্রকুমারী।

অন্যমনা রাণী সনকা বাতায়নে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুখ ফিরিয়ে কন্যাদের দিকে তাকাতে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে থমকে গেল তাঁর দৃষ্টি। রাণী সনকা দেখতে পেলেন, নীচে রাজোদ্যানের অতিথি বাটীকার সম্মুখস্থ পুষ্পদ্রুমবাহু বেষ্টিত অপ্রশস্ত চাতালে দাঁড়িয়ে মৃদু জ্যোৎস্নালোকে কে একজন যেন শুভ্র বসন ঊর্ধ্বে আন্দোলিত করে বোধহয় এই বাতায়নে লক্ষ রেখেই দৃষ্টিগোচর করানোর চেষ্টা করছে। পরক্ষণেই দুই কন্যাকে ডেকে নিয়ে বাতায়ন পথে, উৎসুক দৃষ্টিক্ষেপ করলেন তিনি।

হ্যাঁ অনুমান সত্য। ছুটে গিয়ে দীপাধার থেকে তৈলদীপ তুলে এনে বাতায়নে দাঁড়িয়ে আলোক নিশানা দিল প্রমদা। সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলিত বস্ত্রের সাহায্যে উত্তর এল। প্রমদার হস্ত থেকে দীপ দীপাধারে স্থাপন করে আবার বাতায়নে ফিরে এল রাজকুমারী চন্দ্র।

এতক্ষণে প্রমদার এক রাজকীয় অভিমানক্ষুব্ধ কজ্জলিত আঁখিতারা নীচে রাজোদ্যানে দণ্ডায়মান ভাস্করের মূর্তি চিনতে পেরেছে। স্বপ্নায়িত সুদূরিত এক মুক্ত জীবনের কামনায় প্রমদার ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নে অশ্রু প্লাবিত হয়ে উঠতে চায়। দুই করতল দিয়ে দুই নয়নের বাষ্পাসার মুছে ফেলে ঘুরে দাঁড়ায় প্রমদা।

—আমি যাব।

—প্রমদা! চমকে ওঠেন রাণী সনকা।

—হ্যাঁ মা সকল বাধা অতিক্রম করে যেমন করে হোক আমাকে বাইরে যেতেই হবে নইলে·· ···, কথা শেষ করতে পারে না প্রমদা। নইলে যে কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে তা ভেবে উঠতে পারেন না রাণী সনকা। বস্ত্রমধ্যে একটি তীক্ষ্ণ ছুরিকা গ্রথিত করে নিয়ে শয়ন কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল প্রমদা। ত্রস্ত পদে দিগ্বিজয়িনীর মত।

অতি সন্তর্পণে প্রহরীর চোখ এড়িয়ে সারিবদ্ধ স্তম্ভের আড়ালে আড়ালে আত্মগোপন করতে করতে অলিন্দের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ায় প্রমদা।

সতর্ক দৃষ্টিতে প্রাসাদ দুর্গের পশ্চাত দ্বারগুলির উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল প্রমদা। বিশাল দুর্গাভ্যন্তরের চাতালে ছায়া ছায়া অন্ধকার।

তোরণের ঘণ্টাধ্বনি রাত্রির দ্বিতীয় যাম ঘোষণা করে। অবরুদ্ধ তোরণগুলির সম্মুখে রক্ষীগণ পদচারণা করছে।

বামপ্রান্তে এক ক্ষুদ্র দ্বার। প্রহরায় রত একজন রক্ষী পদচারণা করছিল।

অন্ধকারের ভিতর থেকে প্রমদার তন্বী মূর্তি এগিয়ে এল।

—কে?—প্রহরীর সন্দিগ্ধ স্বর।

কোন প্রত্যুত্তর এল না। প্রমদার মূর্তি ঋজু ভঙ্গিমায় এগিয়ে এল।

—কে ওখানে।—স্তম্ভিত রক্ষীর উন্মুক্ত তরবারির সম্মুখে ততক্ষণে পৌঁছে

গেল প্রমদা। রক্ষীর জীবনে নারীদেহের সান্নিধ্য বড় একটা মেলে না। দ্বারপ্রান্তে ছায়াতলে দাঁড়িয়ে রক্ষীর পিপাসিত বাসনার আশা লুব্ধ হয়। সুযোগ নষ্ট করে না প্রমদা, রক্ষীর দেহলগ্না হয়ে বলে।

—এখানে নয় চল বাইরে যাই।

—বাইরে ?

—হ্যাঁ এখানে কেউ দেখে ফেললে বিপদ হবে।

রসাতলবাসী কামুকের তাড়নায় ধীরে ধীরে দ্বার উন্মুক্ত করে হিমপীড়িত জ্যোৎস্নায় প্রাচীরের ছায়ায় রক্ষী প্রমদার বরতনু আকর্ষণ করে। বিগলিতচিত্তে বোধ হয় চুম্বন করতে চাইছিল রক্ষী। কিন্তু প্রমদার তীক্ষ্ম ছুরিকা তার উদর ভেদ করে গেল। অন্ধকার নেমে এল রক্ষীর কামতাড়িত চক্ষে। তার সংজ্ঞাহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল।

ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘশ্বাস প্রমদার হৃদয় ক্ষণিকের মত কম্পিত করে গেল। পরক্ষণে রাজোদ্যানের তৃণাঙ্কিত পথরেখার উপর দিয়ে ছুটে গিয়ে অতিথিবাটীকার ছায়া অতিক্রম করে অপ্রশস্ত সেই চাতালের উপর গিয়ে দাঁড়াল প্রমদা। উল্লাসলিপ্সু এই পুষ্পস্থলীর সকল চঞ্চলতার মধ্যে সুকঠিন পাষাণ বিগ্রহের মত অবিচল দাঁড়িয়েছিল ভাস্কর।

বিস্মিত অপাঙ্গ দৃষ্টিক্ষেপ করে এগিয়ে এলেন ভাস্কর।

—কে প্রমদা!

অকস্মাৎ মদাবেশমন্থরা বনবায়ু মূর্ছিত হয়।

দুইটি হৃদয়ের চকিতাকাঙ্ক্ষিত আগ্রহের আলিঙ্গনে চমকিত হয় তনু-মন-প্রাণ। পরক্ষণেই সিক্ত মুদ্রিত চক্ষুর পদ্ম বিকশিত করে ভাস্করের বুকের উপর রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরের নিগৃহীতার নিরানন্দ ও শঙ্কিত জীবনের আর্তনাদ ঢেলে দেয় প্রমদা। সময় নেই, জানতে চায় প্রমদা।

—রঘুনাথ ? রঘুনাথ কোথায় ? আকুল হয়ে ভাস্করের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে প্রমদা। নীরব হয়ে ভাস্করের শান্ত কণ্ঠস্বরের নিবেদিত সংবাদ শুনে বজ্রাহত হয় প্রমদার হৃদয়। অকস্মাৎ যেন দৃষ্টিহারা হয়ে যায় প্রমদার অশ্রুসিক্ত দুই নয়ন। হিংস্র ফুৎকারে কে যেন নিভিয়ে দিয়েছে তার দুই নীল কঞ্জরপ্রভ নয়নের আলো।

—ভুল! ভুল হয়ে গিয়েছে। কাতর আক্ষেপে যন্ত্রণাক্ত হয় প্রমদার কণ্ঠস্বর।

—বল, কি হয়েছে প্রমদা বল—অস্থির চাঞ্চল্যে অভিভূত ভাস্করের কণ্ঠস্বর।

—রঘুনাথের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নারীর অধর কুঙ্কুমাপ্লুত পত্রাবলীর নিরব নিবেদন মিথ্যা নয়। সেই নারী স্বয়ং রাজদুহিতা চন্দ্রকুমারী।

—প্রমদা!—যেন এক মর্মজ্বালার স্ফুলিঙ্গ দগ্ধ করে ভাস্করের হৃদয়।

মাথা হেঁট করে স্তব্ধ শিলাপুত্তলিকার মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন ভাস্কর ও প্রমদা।

হঠাৎ প্রাসাদের বাতায়নের দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে প্রমদা। কয়েক মুহূর্ত শুধু কি যেন চিন্তা করে প্রমদা। তারপরেই ভাস্করের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে বলে।

—আজ তুমি আমাকে একবার আশীর্বাদ কর ভাস্কর, যেদিন তুমি ডাকবে, সেদিন যেন তোমার কাছে ছুটে যেতে পারি।

—প্রমদা—ভারাক্রান্ত হয় ভাস্করের কণ্ঠস্বর।

—কিন্তু আর নয়। প্রাসাদের দিকে তাকাও। ওই দুই অসহায়া নারীর কাছে আমাকে ফিরে যেতেই হবে।

—প্রমদা। প্রেমবিধুর পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনে বুকের রক্ত শিহরিত হয়। উৎসবের ক্লান্ত নায়িকার মত ভাস্করের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বলে প্রমদা।

—তুমি বীর। হৃদয় দুর্বল ক'র না, আমি যাই।

রাজোদ্যানের বাতাস হঠাৎ যেন আর্তনাদে আর হাহাকারে পীড়িত হয়ে উঠল। প্রিয়াহীন এক ব্যাপ্ত শূন্যতা অনুভব করেন ভাস্কর। উদ্বেগ সহ্য হয় না। পরমুহূর্তে ত্বরিতপদে এগিয়ে গিয়ে থমকে যায় ভাস্করের হৃদয়, দেখেন শূন্য নির্জন রাজোদ্যানে কেউ নেই।

প্রমদা অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে।

আর এক মুহূর্তও কালক্ষেপ করলেন না ভাস্কর সিংহ। উদ্বিগ্ন চিত্তের উন্মত্ততা নিয়ে ছুটে রাজোদ্যানের বাইরে বেরিয়ে এসে রাত্রির অন্ধকারেই লাউগ্রাম অভিমুখে অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন।

এদিকে।

দুর্গফটকগুলি পরিদর্শন করতে করতে প্রহরীহীন সেই দ্বারপ্রান্তে এসে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তুলে দাঁড়ায় মহীরাম। অনুসন্ধান করে দ্বার উন্মুক্ত দেখতে পেয়ে বহিঃপ্রাচীরের পার্শ্বে ভূমিলুণ্ঠিত ছুরিকাহত প্রহরীর মৃতদেহ বহন করে দুর্গের মধ্যে নিয়ে আসে। কোন দিকেই লক্ষ্য ছিল না প্রমদার। বনমরালীর মত ত্রস্ত পদে সেই দ্বার দিয়েই দুর্গে প্রবেশ করল প্রমদা।

সম্মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল অনুচরসহ স্বয়ং কংসারী।

তার লালসাসিক্ত নিশাচর চক্ষু সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রমদার আপাদ-মস্তক দেখে নিল। এক ক্রূর কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল তার দুই বক্র ওষ্ঠের প্রান্তে। বিষধর সাপের মত হিস হিস শব্দ করে উঠলো কংসারী—

—ও সুযৌবনা, রাজ স্নেহধন্যা কিঙ্করী প্রমদা !

শ্লেষাক্ত কণ্ঠে প্রহরারত কয়েকজন সান্ত্রীকে আহ্বান করে প্রমদাকে বিশ্রাম কক্ষে নিয়ে যেতে আদেশ দিল কংসারী। প্রমদার দিকে কুটিল দৃষ্টি তুলে চেয়ে রইল কংসারী।

শৃঙ্খলিত প্রমদা বিশ্রাম কক্ষের মধ্যে এসে যখন দাঁড়াল, চেয়ে দেখল এই কক্ষের প্রতিটি আসবাব তার পরিচিত। শুধু পরিচিত নয় বাল্যকাল হতে স্পর্শিত হতে হতে মমতা মাধুরীতে প্রলিপ্ত। বিরক্ত হল প্রমদা দীপাধারে দীপ সুচারুরূপে স্থাপিত হয় নি।

এগিয়ে গিয়ে শৃঙ্খলিত হাত তুলে দীপ স্পর্শ করতে চেষ্টা করল প্রমদা।

সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করল কংসারী।

দ্বার রুদ্ধ হল।

চেয়ে দেখল প্রমদা বিশ্রাম কক্ষের সমস্ত দ্বার ও বাতায়ন রুদ্ধ। নিঃশেষিত ভৃঙ্গার দারুবেদিকার উপর রেখে দিয়ে এগিয়ে এল কংসারী। তার মদিরা বিহ্বল চোখ ধর্ষকের লালসায় উন্মত্ত হয়ে উঠল।

ঘৃণায় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল প্রমদার মুখ। কিন্তু বন্ধনমুক্ত করতে পারল না নিজেকে। চিৎকার করে উঠল। কেউ সাড়া দিল না। কংসারীর ভুজ-ভুজঙ্গম টেনে হিঁচড়ে উন্মুক্ত করল প্রমদার উদ্ভিন্ন যৌবন।

একসময়ে শ্রান্ত প্রমদা বিশ্রামাগারের কিংখাবে মোড়া দারুবেদিকার উপর শায়িতা নিজের দেহ কামুক লালসামূঢ় ধর্ষক কংসারীর ঘৃণিত দেহের নীচে আবিষ্কার করল। রাত্রির শেষ যাম বর্বর ধর্ষণের কলুষে কালো হয়ে উঠছে।

রাত্রির অন্ধকারে দু-একটি তারা জ্বলছে।

আলোছায়ায় যেন দুর্বোধ্য এক স্বপ্নলোকের রূপ নিয়ে আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে অরণ্যানী। অশ্বক্ষুরের শব্দ ওঠে। দুটি মানুষ বিলাস-বৈভব আর লোভের রাজ্য থেকে বনরাজির মধ্যে পাকদণ্ডী বেয়ে দ্রুত অশ্বচালনা করছে।

তাদের তীক্ষ্ম চোখে জ্বল-জ্বল করে অস্বাভাবিক দৃষ্টি। অরণ্য কত দীর্ঘ অনুমান করতে পারে না তারা তবু তারা পথ চলে।

ভীতত্রস্ত হয়ে দৌড়ায় বন্য হরিণ, বন্য বরাহের দল। কোন দিকে দৃষ্টি নেই তাদের।

এই দুইজন অশ্বারোহী ভাস্কর সিংহ ও অঙ্গদ রায়।

মধ্য রজনীর ক্ষীণ চন্দ্রলেখায় বনরাজির লতাবধূগণ লাবণ্যপ্রাচুর্যে তরুরাশির শাখায় আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। বন্য পুষ্পভারে স্তবকিত স্তনভার। সজীব লাবণ্য।

অশ্বপদ মঞ্জীরে ধ্বনি বাজে। অনুতাপে পুড়তে থাকে ভাস্করের অশান্ত হৃদয়। রঘুনাথের দর্শন কামনায় অস্থির হয়ে ওঠে তাঁর মন। কতক্ষণে রঘুনাথের ঝঞ্ঝাতাড়িত হৃদয়ের কাছে এ কথা পেঁছে দেবেন ভাস্কর সিংহ। যে কপট অভিসারে ছলিত হয়নি তার অনলশিখ বক্ষের আগ্রহ। মনে মনে আর একবার রোমাঞ্চিত হন ভাস্কর সিংহ। মৃদুস্বরে প্রার্থনা করেন নিপীড়িত আতঙ্কিত প্রদ্যুম্নপুর রাজপ্রাসাদের অন্ধকার ছিন্ন করে নিশ্চয়ই দুই কাঙ্ক্ষিত প্রেয়সীর হাতের বরমাল্য কণ্ঠে ধারণ করবার সুযোগ আসবে একদিন। সফল হবে রাজকন্যা চন্দ্রকুমারীর প্রণয় বাসনা। শেষ হবে প্রমদার দুর্বহ প্রতীক্ষা।

কিন্তু কোথায় রঘুনাথ!

ভীষণ অরণ্যস্থলী অতিক্রম করে সবুজের স্পর্শ ছিন্ন করল অশ্বারোহীদ্বয়। এখানে ইতঃস্তত গুল্মাকীর্ণ গৈরিক প্রান্তরের প্রান্তে উঁচু-নীচু তামাভ তরুলতা-হীন ঈষৎ উচ্চ টিলা-পাহাড় মাথা তুলে রয়েছে।

অশ্ব থেকে নাতিদীর্ঘ একটি বৃক্ষের নীচে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করেন ভাস্কর সিংহ ও অঙ্গদ রায়।

—অঙ্গদ। মৃদুস্বরে আহ্বান করেন ভাস্কর।

—বল। উৎসুক অঙ্গদ।

—এই বনানী মধ্যে কোথায় অবস্থান করছেন রঘুনাথ?

—দ্বাদশ দেহরক্ষী নিয়ে পূর্বারণ্যের কোথাও তিনি শিবির স্থাপন করবেন এই সংবাদ আমাদের কাছে ছিল।

—তিনি কি আরও এগিয়ে গিয়েছেন?

—কংসারীর সৈন্যগণ পশ্চিম অরণ্যভূমি অতিক্রম করে দক্ষিণ অরণ্যভূমিতে প্রবেশ করেছে এ সংবাদ আমরা তাঁর কাছে পেঁছে দিয়েছি। কথা ছিল তিনি আরও পূর্বদিকে এগিয়ে যাবেন কিন্তু……

—মনে হয় তিনি আরও এগিয়েই গিয়েছেন। এখন রাত্রি প্রভাত পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করাই বোধ হয় উচিত হবে।

—হ্যাঁ আমরা শ্রান্ত; অশ্ব দুইটিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাত্রি প্রভাত না হওয়া পর্যন্ত এখানেই আমরা অপেক্ষা করব।

নির্জন প্রাণহীন প্রান্তর জনহীন। রাতের অন্ধকারে তারাজ্বলা প্রান্তরের মাঝে অশ্বদ্বয়ের মুখরজ্জু ধরে সেই বৃক্ষের নীচেই বসে পড়েন ভাস্কর সিংহ ও অঙ্গদ।

ছায়া নামা বনসীমার দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকেন ভাস্কর সিংহ বিস্তৃত বনানীর বন্ধুর পথের পারে প্রদ্যুম্নপুর রাজপ্রাসাদে অন্তরীণ প্রমদা, রাজকন্যা চন্দ্রকুমারী। ভাবতে পারেন না ভাস্কর সিংহ, অধীর ব্যাকুলতা আর অস্থৈর্য তাঁর সারা মনকে অসহ্য যন্ত্রণায় যেন কুরে কুরে খাচ্ছে।

—অঙ্গদ। মৃদুস্বরে ডাকেন ভাস্কর সিংহ। অঙ্গদের দুচোখে গভীর তন্দ্রা। ভাস্করের গলার স্বর কাঁপে, কিন্তু সেই উত্তেজনার কোন ছোঁয়া লাগে না অঙ্গদের বুকে। অনুভব করেন ভাস্কর সিংহ তাঁর হৃদয় নিজের ক্ষোভে জ্বলছে।

এখন আর অন্ধকার নেই। ঝাপসা দেখা যায়। শেষ রাতের আলো ফুটছে। তরুকাণ্ডে দেহভার অর্পণ করে চুপ করে বসে আছেন ভাস্কর সিংহ। সারা দেহে একটা ক্লান্তি আর উত্তেজনার ছায়া। তবু চোখ খোলা। বাতাসে ওঠে মৌন গুঞ্জন ধ্বনি। দূরে আবছা অন্ধকারে মসীলিপ্ত টিলাগুলির সম্মুখ দিয়ে অপচ্ছায়ার মত কিছু সরে সরে যাচ্ছে না? ভাস্কর সিংহের গা ছমছম করে উঠল। শিথিল মস্তিষ্কে ভাবতে থাকেন ভাস্কর সিংহ। সিতিসৌন্দর্যে সিক্ত বসনা সুন্দরীর মত থমকে দাঁড়িয়ে আছে রাত্রির শেষ যাম।

তপস্বী তারাগুলোর অধৈর্য ছটফটানী, তার মধ্যে তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন? স্বপ্নই যদি হয় তাতেই বা ক্ষতি কি? একটি রাত্রি শেষের বিপুল স্বপ্ন বহু রজনীর বিফল ক্রন্দন থেকে মুক্তি, মন্থর অলস সময়। ফেলে আসা স্মৃতির যে ঢেউ ভাস্কর সিংহকে উষ্ণ করছিল তা মিলিয়ে গেল। অন্ধকার আরো পরিষ্কার হয়েছে। চারপাশের এলোমেলো অপচ্ছায়া দৃশ্যমান হয়ে যেন এগিয়ে আসছে।

সোজা হয়ে বসলেন ভাস্কর সিংহ। একটু ভাবলেন যেন; তার পরই দ্রুত অঙ্গদকে ডেকে তুললেন। অঙ্গদ মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

—এরা কারা ভাস্কর সিংহ?

ভাস্কর সিংহ ব্যস্ত হয়ে বললেন—বুঝতে পারছিনা।

—তবে কি কংসারীর সৈন্যবাহিনী? অঙ্গদ ভীতকণ্ঠে বলেন।

এখানে এতদূরে তারা আমাদের সন্ধান পেয়ে গেল?

ভাস্কর সিংহ নিজের মনেই কথাগুলো বললেন। এদিকে প্রান্তরের উপর খুব মৃদু শোনাল মনুষ্যপদ শব্দ।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন অঙ্গদ। দুজনেই দ্রুত তরবারি কোষমুক্ত করলেন। অশ্বের রজ্জু আকর্ষণ করলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই শত শত তীরে বিদ্ধ হল অশ্বদ্বয়। নিদারুণ যন্ত্রণাক্ত হ্রেষাধ্বনিতে হঠাৎ বিদীর্ণ হল সেই নির্জন প্রান্তর।

ভাস্কর সিংহ এবং অঙ্গদ রায় চেয়ে দেখলেন বনপ্রান্তরের টিলা উপত্যকায় বৃহৎ একদল সাঁওতাল তীরন্দাজ ধনুকে তীর সংযোজিত ক'রে তাঁদের বেষ্টন ক'রে রয়েছে।

বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন ভাস্কর সিংহ এবং অঙ্গদ রায়। এই হঠাৎ আক্রমণের অর্থ বোঝবার চেষ্টা করেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য সত্যই মনে

হয় ভাস্কর সিংহের তাঁদের সকল আশা পরিকল্পনা বুঝি চিরতরে ব্যর্থ হয়ে গেল। তবু দুই চক্ষুতে বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করেন ভাস্কর সিংহ।

—তোমরা কি চাও ?

—তলোয়ার ফেলে দাও। চিৎকার ক'রে বলে আক্রমণকারীদের মধ্যে একজন। শাণিত ছুরিকার মত নির্মম সেই আদেশ। নির্মোক মুহূর্তের মধ্যে অস্ত্র ত্যাগ করেন ভাস্কর সিংহ ও অঙ্গদ। দ্রুত বন্ধন বরণ করতে হয় তাঁদের। বনরাজির তরুশীর্ষ চুম্বন ক'রে বল্লীবিতানের বাধা ভেদ ক'রে সূর্য রশ্মিধারা ছড়িয়ে পড়ে। বন্দীদের নিয়ে যাত্রা সুরু করে সাঁওতালবাহিনী। ছায়াচ্ছন্ন বনভূমি পিছনে ফেলে অবারিত সূর্যালোকে আপ্লুত তৃণপথভূমির উপর দিয়ে সম্মুখের ঊষর টিলাভূমির দিকে অগ্রসর হয় তারা। ভাস্কর সিংহের মনে অরণ্যের ছায়া। আর গন্ধে ভরা বনানীর মধ্যে যেখানে উড়ন্ত ভ্রমরের নখরাঘাতে শিথিল হয় মুকুলের স্তবক, সেই ছায়ার নিবিড় রাজ্যে সব চিহ্ন মুছে ফেলা অন্ধকারে ঝিল্লীর মত একসুরে বুকের মধ্যে কম্পন তোলে ভাস্কর সিংহের, সে সুরে বাজে একটি নাম সে নাম প্রমদা।

* * *

মাথার উপর দুপুরের সূর্য। চম্পক পরাগের মত পীতরক্ত রং ডানায় মেখে উড়ে যায় কয়েকটি তিতির। কিছু দূরে দেখা যায় কুটির পংক্তি। বামে জলাভূমি। পথ অতিক্রম করে এক গ্রামপ্রান্তে উপনীত হয় বাহিনী।

ধ্যানস্থ প্রাচীন ঋষির মত ঝুরি নামা বৃহৎ এক বটগাছের নীচে এসে দাঁড়ায় তারা।

ঝাঁ ঝাঁ দুপুর।

শাখায় শালিক উড়াউড়ি করে। রোদ কাঁপে। অদূরে কুটিরের উপান্তে বেণুশীর্ষ নুয়ে আসে। চারিদিকে তীরন্দাজবাহিনী।

তীরের ফলায় ঝক্ ঝক্ করে দিনের আলো।

ইতিমধ্যে বার্তা প্রবাহিত হয়েছে। হঠাৎ কোলাহল শুনতে পান ভাস্কর সিংহ ও অঙ্গদ। চঞ্চল হয়ে ওঠে সাঁওতাল বাহিনী। চমকে ওঠেন তাঁরা। নিমেষের জন্যে মুখের পেশীগুলো কঠিন হয়ে ওঠে। অভ্যাসবশে হাতটা গিয়ে পড়ে তরবারির উপর কিন্তু শূন্য মুঠি ফিরিয়ে নিয়ে সম্মুখে তাকাতেই চোখের তারা দপ্ করে ওঠে ভাস্কর সিংহের। চিৎকার করে ওঠেন তিনি—একি রঘুনাথ!

চমকে ওঠে অঙ্গদ। ভীড় ঠেলে বন্দী রঘুনাথকে ওদের দিকে এগিয়ে যেতে দেয় সাঁওতাল বাহিনী।

—রঘুনাথ তুমিও কি তাহলে বন্দী!—উত্তেজনায় আবেগে ভাস্করের কণ্ঠস্বর ছিঁড়ে গেল, অন্তরের ঝড়ে হৃদয় বুঝি উড়ে যায়। চোখ দুটোয় তড়িৎ হানে,

ঠোঁট কাঁপে ঘন ঘন। ভাস্করের দিকে গভীর জিজ্ঞাসা নিয়ে চেয়ে থাকেন রঘুনাথ ধীরে ধীরে বলেন।

—আমরা জঙ্গলের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে দুর্ধর্ষ সাঁওতাল সর্দার রাম চুনার-এর লোকদ্বারা বন্দী হয়ে পড়েছি। এদের ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণু কুটিল কৌতূহল নাশমেটা পর্যন্ত আমাদের নিস্তার নেই।

—কিন্তু, স্তব্ধ হয়ে এল ভাস্করের কণ্ঠ। মূক অসহিষ্ণুতায় পাণ্ডুর, রক্তহীন মুখে বসে রইলেন ভাস্কর। কয়েক মুহূর্ত পরে হঠাৎ বলে উঠলেন।

—কিন্তু আমাদের মুক্তি চাই রঘুনাথ। যে কোন মূল্যে। কেন না প্রদ্যুম্নপুর রাজপ্রাসাদে আজ বড় বিপদ।

—বিপদ! উদ্বিগ্ন বক্ষের অস্থিনিচয় যেন বেদনায় দীর্ণ হয় রঘুনাথের হঠাৎ বিচলিত হয় দুই চক্ষুর দৃষ্টি, কিন্তু পরক্ষণেই সারা দেহ মন্থিত করে এক অভিনব বেদনার ঝড় আকুল হয়ে ওঠে। সেই ঝড় অটল নিষেধের প্রতিমূর্তির মত রঘুনাথের বুকে বাজে। ধীরে ধীরে বলেন।

—আজ প্রদ্যুম্নপুরের জন্য আমার কিছু করার অধিকার নেই বন্ধু। আমি স্বেচ্ছায় নির্বাসন নিয়েছি।

—রঘুনাথ!—আশাহত স্বরে কিছু বলতে চান ভাস্কর, কিন্তু বাধা দিয়ে আবার বলেন রঘুনাথ।

—না ভাস্কর···, কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন রঘুনাথ। তারপর শান্তভাবে বলেন।

—ভাস্কর, প্রতিক্ষণে শুনতে পাচ্ছি সেই প্রাণের আহ্বান। শ্রান্তিতে আমি খুঁজি তার সেবা, শান্তিতে সান্নিধ্য, সংকল্পে সাহায্য। কিন্তু মুহূর্তের দুর্বলতায় নিষ্ঠুর প্রত্যাখান দিয়ে আমি সেই অদেখাকে সেই প্রণয়ভীরু কুমারীর হৃদয় ব্যথিত করে হত্যা করতে পারব না। আর সেই জন্যেই প্রদ্যুম্নপুর থেকে আজ আমি অনেক দূরে।

—কিন্তু সেই রূপাভিরামা পুজার্থিনী সশ্রদ্ধ আগ্রহে তোমার পথ চেয়ে প্রতিটি মুহূর্ত তোমারই অপেক্ষায়।

—আমার অপেক্ষায়। কোথায়, বল ভাস্কর কোথায় সে?

রঘুনাথের নেত্র-বিচ্ছুরিত আগ্রহবহ্নি ভাস্করের অন্তরে প্রবেশ করে।

—প্রদ্যুম্নপুর রাজপ্রাসাদে। দৃঢ় কণ্ঠে বলেন ভাস্কর সিংহ।

—ভাস্কর! বিস্মিত নির্মোক রঘুনাথ।

—হ্যাঁ রঘুনাথ, প্রদ্যুম্নপুরাধিপতি রাজা নৃসিংহদেবের কন্যা রাজতনয় চন্দ্রকুমারী তোমার প্রণয়প্রার্থিনী।

অকস্মাৎ সন্ত্রস্তের মত চমকে উঠলেও ধীর দৃষ্টি তুলে প্রশ্ন করেন রঘুনাথ।

—সত্য বল ভাস্কর এই ছল ভাষ্যের প্রকৃত কারণ কি?

—বিশ্বাস কর বন্ধু। কোন ছলনা বহন করে আনিনি। আমি পূর্বে জানতেও পারিনি কিন্তু বিগত রাত্রির এক কণ্টকক্ষত বিব্রত অভিসারে প্রিয়া প্রমদার কাছ থেকে সব জেনে তোমার অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

—প্রিয়া প্রমদা? ভাস্কর প্রমদা কি? …কথা শেষ করেন না রঘুনাথ কেবল সমোৎসুক দৃষ্টি তুলে ভাস্করের মুখের দিকে তাকান।

—হ্যা রঘুনাথ; সে আমার তৃষ্ণার্ত বক্ষের শিহরিত তৃপ্তি।

আর দ্বিধা করেন না রঘুনাথ, ধীরে ধীরে দৃষ্টি প্রসারিত করেন। তাঁর মুগ্ধ দৃষ্ঠি হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। সন্ত্রস্তের মত বিচলিত কণ্ঠস্বরে আবার প্রশ্ন করেন। জানতে চান সাগ্রহচিত্তে।

—প্রদ্যুম্নপুর রাজপ্রাসাদে আজ কিসের বিপদ ভাস্কর? কংসারী কি আর কোন অনর্থ ঘটিয়েছে?

—রাজা নৃসিংহদেব সপরিবারে রাজপ্রাসাদে বন্দী। কংসারীর লোভ ও লালসা যে কোন মুহূর্তে অঘটন ঘটাতে পারে। রাজানুগত সামান্য যে কয়জন অমাত্য এখনও উৎকোচে বশীভূত হয়নি তারা প্রাসাদে প্রবেশ করতে পারছে না।

স্তব্ধ হয়ে শোনেন রঘুনাথ। তাঁর অন্তরে যেন দূর কাননের নিভৃত হতে এক স্তবকিত কিংশুকের দ্যুতি মৃদুপবন কম্পনে সঞ্চারিত হতে থাকে। প্রমজয়ের এক প্রশান্ত আনন্দ ত্বরিতে তাঁর বক্ষ স্পর্শ করে; কিন্তু বিষাদালস দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে দেখেন তাঁদের চারিদিকে সাঁওতাল বাহিনী অনড় প্রহরায় অটল হয়ে দাঁড়িয়ে।

বটবৃক্ষের নীচে প্রাক-অপরাহ্ন স্থবির হয়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যান রঘুনাথ। প্রহরারত সাঁওতাল বাহিনী চঞ্চল হয়ে ওঠে।

—খবরদার। চিৎকার করে ওঠে একজন।

—কি চাও তোমরা? কেন আমাদের আটকে রেখেছ? সেই বক্তার মুখের উপর দৃষ্টি ফেলে প্রশ্ন করেন রঘুনাথ।

—সর্দার না এসে পৌঁছান পর্যন্ত তোমাদের এমনিভাবেই অপেক্ষা করতে হবে।

—তবে আমাদের নিয়ে চল তোমাদের সর্দারের কাছে। আন্তরিকতার সঙ্গে বলেন রঘুনাথ।

—হুকুম নেই, এখানেই অপেক্ষা করতে হবে।

—কখন আসবেন তোমাদের সর্দার। এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেন ভাস্কর।

—এলেই দেখতে পাবে। সংক্ষিপ্ত উত্তর।

বৃক্ষতলে নিশ্চুপ বসে ছিলেন অঙ্গদ। রঘুনাথ ও ভাস্কর এসে তাঁর পাশে উপবেশন করেন।

তরুছায়া যেন দুর্বোধ্য রহস্যময় হয়ে ওঠে। তাঁরা রুদ্ধ পৌরুষের জ্বালা সহ্য করতে থাকেন নীরবে।

হঠাৎ গুঞ্জন ধ্বনিতে চমকে ওঠেন তাঁরা।

—'সর্দার, সর্দার।' সমবেত গুঞ্জন।

হর্ষধ্বনি।

অভিবাদন।

ভীড় ঠেলে সম্মুখে এসে দাঁড়ায় কজঙ্গলের সাঁওতাল সর্দার রামু চুনার। কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করে—

—তোমরা কজঙ্গলে কেন এসেছ?

রামু চুনারের ক্রুদ্ধ প্রশ্ন শুনে উঠে দাঁড়ান রঘুনাথ। বলেন—আমরা প্রদ্যুম্নপুর ছেড়ে উত্তরাভিমুখে চলে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতার উদ্দেশ্য নেই।

—প্রদ্যুম্নপুর? চিৎকার করে ওঠে রামু সর্দার। দিনের পর দিন যে রাজার লোক লুঠ করেছে আমার গ্রামের পর গ্রাম? সেই রাজ্যের লোক তোমরা?

হ্যাঁ সর্দার, কিন্তু আমরা লুটেরা নই, আমরা সেই রাজ্য থেকে বিতাড়িত। রাজাও লুটেরা নয়।

রঘুনাথের মুখের উপর তাকিয়ে থাকে রামু সর্দার। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে যেন আহত হয় তার দুই চক্ষুর কৌতূহল। প্রশ্ন করে,

—কেন? কি জন্য বিতাড়িত তোমরা? কে তবে লুণ্ঠক?

—সে অনেক ঘটনা সর্দার। তবে এইটুকু তোমার জানার দরকার রাজসেনাপতি কংসারীর ষড়যন্ত্রে প্রদ্যুম্নপুর রাজ্যে আজ অন্ধকার নেমে এসেছে।

বৃক্ষতলে দাঁড়িয়ে অনুচরদের দিকে ফিরে একবার তাকিয়ে দেখল রামু চুনার, ধীরে ধীরে ফিরে দাঁড়ায় রামু চুনার। তার চক্ষু প্রখর হয়ে জ্বলতে থাকে।

—তোমাদের বিশ্বাস করি না। কজঙ্গল থেকে তোমরা জীবিত ফিরবে না। তোমাদের দ্বাদশ অনুচরসহ তোমরা একদিন আমাদের বন্দীশালায় বন্দী থাকবে। ইতিমধ্যে আমরা খুঁজে দেখব আর কোন লোক গোপনে আমাদের এলাকায় প্রবেশ করেছে কিনা।

অবশেষে সন্ধ্যার ছায়া যখন কজঙ্গলের লাল বালি আর কাল জলাভূমির উপর তার আঁচল বিছিয়ে দিল তখন সর্দার রামুচুনার আখড়ায় ফিরে গেল। আর একদল তীরন্দাজ সাঁওতাল রঘুনাথ, ভাস্কর ও অঙ্গদকে নিয়ে

সর্দারের বন্দীশালার উদ্দেশ্যে রওনা হল। সবুজ দূর্বাদলের উপর পা পড়ল রঘুনাথের। গাছগুলি এখানে আবার সন্নিবেশিত, দীর্ঘ। দূর থেকে তাকিয়ে দেখলেন রঘুনাথ, ঘন বনসীমাকে পিছনে রেখে শান্ত সমাহিত একটি পরিবেশ। সর্দারের আবাস একটি ছোটখাট দুর্গের মত। আবছা অন্ধকারে কিসের শব্দ শুনে সচকিত হন রঘুনাথ।

এ শব্দ তাঁর চেনা।

ঘোড়ার খুরের শব্দ। কয়েকটা ঘোড়া অন্ধকারে বাঁধা আছে। তারা মাটিতে পা ঠুকছে।

অন্ধকার অতিক্রম করে একটি প্রশস্ত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় তাঁদের। চারিদিকে সজাগ প্রহরা। গৃহমধ্যে একটি মশাল জ্বলছে।

একজন কিছু ঘৃতপক্ক চাপাটির সঙ্গে আখের গুড় ও দুধ নিয়ে তাঁদের খেতে অনুরোধ করে চলে গেল।

পাষাণীভূত বৃক্ষরাজির মত স্তব্ধ নির্বাক রাত্রি ধীরে ধীরে কুণ্ডলীত হয়ে আসে।

ওদিকে।

রাজা নৃসিংহদেবের আলয়ে। রাণীকক্ষে মহীরাম কংসারীর দৌত্য বহন করে আনে। ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মত ফেনিলোচ্ছল স্বরে আদেশ করেন রাণী সনকা।

—যাও অন্তঃপুর ছেড়ে চলে যাও।

কিন্তু ভ্রূকুটি করে মহীরাম। ক্রোধদীপ্ত স্বরে ধীরে ধীরে বলে।

—আপনার ক্রোধ নিরর্থক মহারাণী। রাজা নৃসিংহদেব আজ বয়ঃপ্রবীণ, জরাগ্রস্ত; সেনাপতি কংসারী কর্তৃক কারারুদ্ধ। আপনি সকন্যা এই রাজপ্রাসাদে অন্তরীণ। এমত অবস্থায়···

কথা শেষ করতে পারে না মহীরাম। ভ্রূভঙ্গী কঠোর করে রানী সনকা চিৎকার ক'রে ওঠেন।

—ভুলে যেও না মহীরাম। প্রদ্যুম্নপুর রাজ্যের মানুষ নির্বীর্য নয়। তোমাদের শক্তির অহঙ্কার চূর্ণ হবেই যেমন করেই হোক। রাজপ্রাসাদের বাইরে তোমাদের দুষ্কৃত্যের সংবাদ পেঁাছাবে আর তখন···

হেসে ওঠে মহারাম। কুৎসিত ভঙ্গীতে দু'পা এগিয়ে এসে বলে।—আপনি উৎসাহ সংবরণ করুণ মহারাণী। রাজপ্রাসাদের বাইরে আপামর জনসাধারণ জ্ঞাত আছে যে, মহারাজা নৃসিংহদেব স্বেচ্ছায় তাঁর কন্যা চন্দ্রকুমারীর সঙ্গে মহামান্য সেনাপতি কংসারীর বিবাহ স্থির ক'রে রাজ্যভার তাঁর হাতে অর্পণ করে বিশ্রাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কাজেই—

—কাজেই? রাণী সনকার চক্ষুর তীক্ষ্ন দৃষ্টি জ্বলতে থাকে।

—সেনাপতি কংসারীর নিন্দাবাদ প্রকাশের দুঃসাহস সংবরণ করে নিজ কন্যার যৌবনীত জীবনের অপমান সহ্য করার দুর্ভাগ্য বরণ করতে চাইবেন না—আশা করি।

—এই কে আছিস—রক্ষী, প্রহরী। চিৎকার করে ওঠেন রাণী সনকা। কিন্তু আকস্মিক ও রূঢ় বিস্ময়ে চমকে ওঠেন। কেউ আসে না। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে মহীরাম। হাসতে হাসতে বলে।

—জানিনা নিজের অবস্থা আপনি বুঝতে পারছেন কিনা। দুইদিন সময় দেওয়া হয়েছে আপনাকে ; ইতিমধ্যে মনস্থির করে কন্যা পাত্রস্থ ক'রে জীবনের শান্তি ফিরে পেতে পারেন। অন্যথায় নিদারুণ প্রায়শ্চিত্তের কথা মনে রাখবেন। দৌত্য সমাপন ক'রে দৃঢ়পদে ফিরে যায় মহীরাম।

হঠাৎ যেন এক কঠোর বাস্তব সত্যের আঘাতে কেঁপে ওঠেন রাণী সনকা। কক্ষাভ্যন্তরে ফিরে আসেন। বিমূঢ় কন্যা চন্দ্রকুমারী দ্বারপ্রান্ত হতে সবই শুনেছে। নীরব হয়ে থাকতে পারে না চন্দ্রকুমারী। দুঃসহ বেদনার বক্ষঃপঞ্জরে কাতরতার ধ্বনি তুলে জিজ্ঞাসা করে।

—মা, বাবাকে আর প্রমদাকে ওরা কোথায় নিয়ে গিয়েছে ?

চমকে উঠলেন রাণী সনকা। যে নির্মম প্রশ্নের সঙ্গে মনের গোপনে আলাপ করছিলেন তিনি কন্যা চন্দ্রকুমারী কি তাই শুনতে পেয়েছে ? একটি বিষন্নতার ছায়া তাঁর দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে সঞ্চালিত হতে থাকে।

কুমারী অনূঢ়া অসীমন্তিনী কন্যাকে বিপুল আবেগে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন রাণী সনকা। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন তিনি, তারপর শোকার্তের মত ক্রন্দনের সুরে বলেন।

—প্রমদা প্রাসাদের বাইরে সংবাদ পেঁাছে দিতে পেরেছে বলে আমি বিশ্বাস করি কন্যা। আর কামনা করি সে প্রাসাদের বাইরে বিপদমুক্ত হলেও নিশ্চেষ্ট থাকবে না। ভাস্কর, রঘুনাথ এরা চুপ করে বসে থাকতে পারে না।

চন্দ্রকুমারীর চক্ষু বাষ্পায়িত হয়ে ওঠে। তার শূন্যবক্ষের যাতনা অশ্রুস্রোত হয়ে ঝড়ে পড়ে। 'রঘুনাথ' বক্ষের নিভৃতে সেই সুন্দর তনুচ্ছায়া তার গোপন জীবনের সকল ইতিহাস গুঞ্জরিত হয়ে শুনিয়ে দিয়ে যায়। রাত্রির অদৃশ্য ভ্রূকুটির মধ্যে রাজকুমারী চন্দ্রের কজ্জলিত নয়নের দৃষ্টি উদাস ও করুণ হয়ে স্থিরস্ফুলিঙ্গের মত জ্বলতে থাকে।

* * *

বৃশ্চিক দেখা দিয়েছে আকাশে।
চোখে ঘুম নেই পঞ্চানন ঘোষালের।
অন্ধকার নেই, চাপা জ্যোৎস্না।

লাউগ্রামে 'মাতৃকুটির'-এর অলিন্দ থেকে বকুলবিথীর ছায়ার দিকে তাকিয়ে পঞ্চানন ঘোষাল যেন পদধ্বনি শুনতে পেলেন। পিলসুজের উপর রাখা সেজের দীপ অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। একটু উসকে দিলে আলো হয়তো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কিন্তু তা করলেন না পঞ্চানন ঘোষাল। অন্ধকারে ওরা এগিয়ে এল। এগিয়ে গিয়ে অলিন্দ অতিক্রম করলেন পঞ্চানন ঘোষাল।

অন্ধকারে মাটির উপর বসে স্তিমিত চন্দ্রিমালোকে আগন্তুকদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন পঞ্চানন ঘোষাল।

—বল কি সংবাদ ?

—কংসারীর উৎকোচে বশীভূত হয়ে বেশ কিছু অমাত্য তার পক্ষ অবলম্বন করেছে। মহীরাম নেতৃত্ব দিচ্ছে যোতবিহারের শাসন ব্যবস্থায়।

—তারপর।

—সংবাদ পেয়েছি প্রদ্যুম্নপুরের সাধারণ মানুষ এবং কিছু অমাত্য যোতবিহারের প্রায় সমস্ত রাজকর্মচারী এমন কি সৈনিকেরাও মনে মনে বিদ্রোহ পোষণ করছে। কংসারীর বিরুদ্ধে তাদের শক্তি প্রয়োগ করতে তারা প্রস্তুত।

—"জয় শ্রীবিষ্ণু" হঠাৎ রক্ত মুখে ছুটে আসে পঞ্চানন ঘোষালের। হাঁটুর উপর থাবা মেরে বলেন।—

কংসারীর দিন ফুরিয়ে এসেছে, তোমরা প্রস্তুত হও। দ্রুত প্রচার কার্য সমাধা কর।

—কিন্তু রঘুনাথ ? বিনীত প্রশ্ন করে আগন্তুকদের মধ্যে একজন।

—সে ভার আমার। কাল প্রত্যুষে।······বলতে বলতে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন পঞ্চানন ঘোষাল। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে দেখেন অন্ধকার কমে আসছে, ঝাপসা দেখা যায়। শেষ রাতের আলো ফুটছে। আদেশের ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়ান তিনি। বলেন।

—যাও বিশ্রাম কর সকলে।

মাটির রাস্তায় খুব মৃদু শোনায় পদশব্দ। ওরা চলে যায়। ধীরে ধীরে পঞ্চানন ঘোষাল নিজভবনের দিকে অগ্রসর হন।

আরো কিছু পরে এক অন্বেষণকারী অশ্বারোহী প্রায়ান্ধকার বনপথে উত্তরাভিমুখে অশ্ব ছুটিয়ে দেয়।

আকাশে পুতস্তব্ধ সূর্য। কুয়াশা ঝরে গেছে। আকাশ নীল। সুগন্ধে বাতাস ভারী। কজঙ্গলের দিগন্তের গম্বুজ ইতিমধ্যেই শোভিত হয়েছে নব পত্রালিকায়। পলাশফুল পাপড়িগুলোকে টান টান করে মেলে দিচ্ছে সূর্যের দিকে।

প্রহরাবেষ্টিত রঘুনাথ এক সরোবর তটের নির্জন একান্তে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা

করেন—"আলো দেখাও প্রভু" তারপর ধীরে ধীরে বন্দীশালার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

ঠিক সেই সময় সর্দার রামু চুনারের নির্দেশে বন্দীদের নিয়ে এগিয়ে আসে একটি বাহিনী। রঘুনাথকে সঙ্গে নিয়ে সর্দারের আবাসে রওনা হয় তারা। অন্তরের এক বিষণ্ণ বেদনাকে লুকিয়ে রেখে ধীরে ধীরে বলেন ভাস্কর।

—আজই বিচার সমাধা করবে সাঁওতাল সর্দার। যদি····· কথা শেষ করতে পারেন না ভাস্কর সিংহ। রঘুনাথ আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করেন।

—বিপদে ধৈর্য হারিও না বন্ধু, দেখাই যাক কি হয়।

বিশাল দারুপ্রাচীর বেষ্টিত একটি চাতালে প্রবেশ করেন তাঁরা। সেই চাতালের এক পার্শ্বে একটি অনুচ্চ মঞ্চের উপর অমসৃণ খণ্ডিত তরুকাণ্ডের বেদীকা। অপর পার্শ্বে একটি নাতিদীর্ঘ মুক্তাঙ্গণে রঘুনাথ ভাস্কর ও অঙ্গদকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দক্ষিণ ও বাম প্রাচীরের সঙ্গে সমান্তরাল ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান হল সাঁওতাল বাহিনী। আজ তারা তীর ধনুক সড়কি তরোয়ালে সজ্জিত। কিছুক্ষণের মধ্যে রঘুনাথের অপর দ্বাদশ রক্ষীগণকেও সেইস্থানে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল।

দ্রিমি দ্রিমি মাদল বেজে উঠলো। কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে মঞ্চে উঠে দারুবেদিকার উপর উপবেশন করল সর্দার রামু চুনার।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন তীরন্দাজ বন্দীদের সম্মুখে প্রায় দশ হাত দূরে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল, ডান হাতে তাদের সুতীক্ষ্ম তীর বাম হাতে ধনুক। সর্দারের মঞ্চের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল তারা।

বুকের ভিতর এক ঝলক রক্ত চলকে ওঠে ভাস্করের, চীৎকার করে ওঠেন তিনি।

—রঘুনাথ মরতে হলে···

কথা শেষ করতে পারলেন না ভাস্কর। মঞ্চ থেকে চীৎকার করে উঠলো রামু সর্দার।

—সাবধান। কোন রকম নড়াচড়া করলে আমার সৈন্যবাহিনী বিষাক্ত তীরে তোমাদের মুহূর্তে গেঁথে ফেলবে।

শীতল পাথুরে দৃষ্টি সামনের দিকে মেলে ধরে আবার বলে সর্দার রামু চুনার।

—মৃত্যুর পূর্বে তোমাদের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে আদেশ জারি করে সর্দার।

—তোমরা তোমাদের কর্তব্য করে যাও।

আদেশ পাওয়ামাত্র কয়েকজন কাজে লেগে গেল। একজন পায়ে পায়ে বন্দীদের দিকে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল।

—তোমাদের মধ্যে কে তোমাদের প্রতিনিধিত্ব করতে চাও ?

এগিয়ে এলেন রঘুনাথ। তার মুখে চোখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। একজন তাঁকে সর্দারের সামনে নিয়ে এল। চতুর্দিকে এক অস্বাভাবিক নীরবতা।

সেই নীরবতা ভঙ্গ করে সর্দার রামু চুনার প্রশ্ন করল।

—মৃত্যুর পদশব্দ নিশ্চয়ই তোমরা শুনতে পাচ্ছ। তার আগে কিছু বলবার আছে ?

—আছে। আমরা তোমার কোন ক্ষতি করিনি। আমরা তোমাদের শত্রু নই।

—কিন্তু প্রদ্যুম্নপুরের কোন রাজকর্মচারীকে আমরা ক্ষমা করব না। তারা আমাদের শত্রু।

—সর্দার, প্রদ্যুম্নপুরের সমস্ত রাজ কর্মচারীই সমান নয়। স্বয়ং রাজা নৃসিংহদেব কারও অনিষ্টকারী নন। আমাদের হত্যা করে, তোমার সত্যিকারের শত্রু যারা তাদের আরো সুবিধাই করে দেবে তুমি। চক্‌চকে চত্বর ঘিরে কাঠের প্রাচীরের কালো কালো ছায়ার উপর চোখ বুলিয়ে রঘুনাথের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সর্দার রামু চুনার। উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রঘুনাথের মনটা হঠাৎ দমে গেলেও তিনি মনে মনে হিসেব করে দেখলেন এখান থেকে সর্দারের মঞ্চ চার হাত উঁচু হবে। সর্দারের পাশে একজন মাত্র বল্লমধারী। রঘুনাথ ধীরে ধীরে সর্দারের দিকে চোখ ফেরালেন। চত্বরের প্রাচীরের পার্শ্বে সারিবদ্ধ সৈনিকেরা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো। তারা তখনো ঠিক বুঝতে পারেনি রঘুনাথের উদ্দেশ্য কি। রঘুনাথ ততক্ষণে চিতাবাঘের মত লাফ মেরে মঞ্চের পাটাতন ধরেছেন বজ্রমুষ্ঠিতে। দিশেহারা হয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় রামু সর্দার। পরমুহূর্তেই রঘুনাথের বিপুলবল-স্পর্ধিত বাহুর আঘাতে বল্লমধারী সৈনিক মঞ্চ থেকে ছিটকে নীচে আছড়ে পড়ল আর তার হাতের বল্লম দক্ষিণ মুষ্ঠিতে নিয়ে রামু চুনারের বুকের উপর চেপে ধরলেন রঘুনাথ। সৈন্যেরা ছুটে আসছে মঞ্চের দিকে। তীরন্দাজীরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। সৈনিকদের কানে এল রঘুনাথের বজ্রগম্ভীর স্বর।

—খবরদার এক পা এগুলে সর্দারের বুকে বল্লম বিঁধিয়ে দেব।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই।

—আমার লোকদের মঞ্চে উঠে আসতে দাও সর্দার।

সর্দার রামুচুনার পিঠের উপর তীক্ষ্ম বল্লমের স্পর্শ অনুভব করল। রঘুনাথ সর্দারের অন্ধকার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন।

—মনে রেখ সর্দার আমরা মরলে তুমিও মরবে।

সর্দার রামু চুনার রঘুনাথের বিশাল শক্তিমত্তা অনুভব করতে পারল। সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে আদেশ করল।

—ওদের আসতে দাও।

রঘুনাথের ইঙ্গিতে মঞ্চের উপর উঠে এল বন্দীরা। কোন অঘটন ঘটল না। রঘুনাথের আদেশ মত অস্ত্র ত্যাগ করে সারি সারি দাঁড়াল সাঁওতাল বাহিনী। কারো মুখে কোন কথা নেই।

পাষাণীভূত বৃক্ষের মত স্তব্ধ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সর্দার রামু চুনার।

ধীরে ধীরে সর্দারের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন রঘুনাথ। হাতের বল্লম ফেলে দেন। সর্দারের চোখের ভিতর দৃষ্টি ফেলে বলেন।

—সর্দার তোমাকে মারতে চাই না। শুধু বলতে চাই আমরা তোমার শত্রু নই।

রঘুনাথ মঞ্চের উপর থেকে বল্লম তুলে নিয়ে পুনরায় সর্দারের হাতে দেন। বলেন।

—সর্দার এবার ইচ্ছে করলে তুমি আমাদের মারতে পার।

কিন্তু সর্দারের মন তখন অন্যদিকে। সে এক দৃষ্টে সৈনিকদের লক্ষ্য করছিল। এগিয়ে এসে চীৎকার করে উঠল।

—দাঁড়াও।

রঘুনাথ পিছন ফিরে মঞ্চের সম্মুখে চত্বরে তাকিয়ে দেখলেন ইতিমধ্যে সৈনিকেরা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। কয়েকজন ধনুকে তীর সংযোগ করে মঞ্চের ঠিক নীচে রঘুনাথের উপর লক্ষ্য স্থির করে দাঁড়িয়ে। সর্দারের আদেশ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তারা, আর ঠিক সেই মুহূর্তে মঞ্চের নীচ থেকে এক তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠ শুনতে পায় সকলে।

—দাদা!

নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে দেখেন রঘুনাথ।

ঝঞ্ঝাহত কাননের উৎক্ষিপ্ত ব্রততীর মত ছুটে মঞ্চের উপর উঠে আসে এক সুযৌবনা কুমারী। রঘুনাথের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে সুন্দর বিম্বাধর কম্পিত করে বলে।

—দাদা তুমি!

অকস্মাৎ যেন এক তৃপ্ত স্বপ্নের উল্লাসে বিচলিত হ'য়ে ওঠেন রঘুনাথ, হৃদয়ের আগ্রহ নিয়ে একটি হাতে সেই নারীর করস্পর্শ করে বলেন।

—ফুলকী তুই?

সর্দার রামু চুনারের দৃষ্টি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কৃতার্থভাবে রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করে।

—আমার কন্যা ফুলকীকে তুমি কি করে চিনলে?

ফুলকী এগিয়ে এসে পিতার সামনে দাঁড়ায়। ব্যথাহত লতিকার মত শিহরিত হয় ফুলকীর নমিত দেহ। পিতার মুখের উপর চোখ তুলে বলে।

—বাবা তুমি জান না, ইনিই প্রদ্যুম্নপুরের দস্যুর হাত থেকে সেদিন আমাকে উদ্ধার করেছিলেন, রক্ষা করেছিলেন আমার সকল কৌমার্য, আমার জাতির সম্মান।

ক্রন্দনের শব্দহারা বিলাপের মত আবার বলতে থাকে ফুলকী—বাবা, সেই দাদাকে তুমি মারতে যাচ্ছ, এত কষ্ট দিয়েছ?

কন্যার বিলাপ ধ্বনি সর্দার রামু চুনারের বক্ষের শ্বাসবায়ুকে হঠাৎ আঘাতে আহত করে। বিস্মিত সর্দার রঘুনাথের দিকে ফিরে চায়, জিজ্ঞাসা করে।

—তবে আপনিই কি ষোতবিহার রাজ রঘুনাথ?

—হ্যাঁ সর্দার; আকাশভ্রষ্ট নক্ষত্রের মত আমিই সেই হতভাগ্য রাজা রঘুনাথ।

—'ক্ষমা করুন রাজা।' রামু সর্দার রঘুনাথের বাহু আকর্ষণ ক'রে বলে। 'আমার মেয়েকে যদি বোন বলে স্বীকার করে থাকেন তবে···।' কথা শেষ করতে পারে না রামু সর্দার। চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো।

—সর্দার।—রঘুনাথ রামু সর্দারের কাছে এগিয়ে গেলেন। প্রায় ধরা গলায় ফিস্ ফিস্ ক'রে বললেন।—তুমি সর্দার, আমি ছিলাম রাজা। আমরা বীর, অন্যায়ের সঙ্গে আমরা লড়াই করি,—আমাদের কাঁদতে নেই।

—রাজা! আবেগাপ্লুত সর্দার রামু চুনারের কণ্ঠস্বর।

সে এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। পরক্ষণেই বিপুল আবেগে রঘুনাথকে বুকে চেপে ধরে।

প্রাক্-সান্ধ্য বায়ুর মৃদু শীতসঞ্চারে আবার শান্ত ও স্নিগ্ধ হ'য়ে ওঠে কজঙ্গলের সাঁওতাল সর্দার রামু চুনারের আবাস। কৃতাঞ্জলী করে এবং প্রসন্ন হৃদয়ে আনন্দ নিবেদন করে সর্দার দুহিতা ফুলকী।

—দাদা। উৎসাহিত শোনা যায় ফুলকীর কণ্ঠস্বর।

—বল বোন। সকৌতুকে প্রশ্ন করেন রঘুনাথ।

—বাবা তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাকে সাহায্য করবে।

—সত্যি! সমোৎসুক রঘুনাথ।

—হ্যাঁ রাজা। মৃদুহাস্য স্ফুরিত করে সর্দার।

—সর্দার। প্রদ্যুম্নপুরবাসী কোনদিন তোমাকে ভুলবে না। যদি সত্যিই আমাদের সমবেত প্রচেষ্টায় প্রদ্যুম্নপুর রাহুমুক্ত হয় তবে ভাবীকালের ইতিহাস তোমাকে চিরদিন মনে রাখবে।

রাজা রঘুনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে অভিভূত হ'য়ে পড়ে কজঙ্গলের সর্দার রামু চুনার। সমবেত সৈনিকদের দিকে ফিরে চিৎকার করে ওঠেন রামু সর্দার।

—জয় রাজা রঘুনাথের জয়।

সমবেত বাহিনী সমস্বরে চীৎকার করে ওঠে।

—জয় রাজা রঘুনাথের জয়।

তখন অপরাহ্ন—আকাশবক্ষে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে ক্লান্ত দিবসের সৌরকরশোভা। সন্ধ্যার রক্তরাগ ফুটে ওঠে শান্ত চিতানল দ্যুতির মত।

* * *

স্তব্ধ রাত্রি।

আঁধার আকাশে তারাগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বাতাসে বনানীর উদগ্র কামনামদির সুবাস। পত্রমর্মরে নীরব ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে।

ব্যাকুলতা রঘুনাথের বুকেও। দূর জলাভূমি হ'তে দাত্যুহের কলনাদ শোনা যায়। রাত্রি শিশিরবাষ্পে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। এত স্পষ্ট ক'রে নিজের ভুল আর ক্ষতিয়ে কোনদিন বুঝি বুঝতে পারেননি রঘুনাথ। উন্মুক্ত আকাশের নীচে তারাজ্বলা আলো ছায়ায় একাকী দাঁড়িয়ে আছেন রঘুনাথ। বক্ষের পাশের বস্ত্রাভ্যন্তর হতে ধীরে ধীরে সযত্নে বের করে আনেন কুঙ্কুমে রঞ্জিত অধর সুষমা আলিম্পিত বহুযত্নে রক্ষিত সেই হরিদ্রাভ দেওদার পত্র। তাঁর অন্তর মন্দিরের একমাত্র প্রেমস্পর্শ।

ধীরে ধীরে দয়িতের সাকাঙ্ক্ষ্য চুম্বনে সিক্ত হয় প্রিয়া স্পর্শ ধন্য সেই চিত্রিত পত্রালিকা। মনে মনে বলেন রঘুনাথ—"কেন তোমার অধরের সুস্মিত আনন্দ গোপন করে রেখেছ ? কেন আমায় জানতে দাওনি, যদি পূর্বাহ্নে জানতে পারতাম তবে…"

মনে মনে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন রঘুনাথ।

প্রদ্যুম্নপুর রাজপ্রাসাদে কোন নিষ্ঠুর চক্রান্ত নেমে এসেছে কে জানে। মনের গভীরে বিষণ্ণ মেঘের মত একটি স্তব্ধ দীর্ঘশ্বাস অনুভব করেন রঘুনাথ। তৃণাস্তীর্ণ ভূমির উপর দাঁড়িয়ে হঠাৎ লক্ষ্য করেন রাত্রির অন্ধকার ক্লান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়তে চাইছে পশ্চিম দিগবলয়ে। উন্মত্ত পিপাসার মত দুই ব্যগ্র হস্তের বিপুল আগ্রহে সেই 'পত্রালিকা' বক্ষবস্ত্রের মধ্যে স্থাপন করে দ্রুত অগ্রসর হতে গিয়ে দেখতে পান, ভাস্কর সিংহ তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন। বিস্মিত হন রঘুনাথ কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারেন তাঁর মতই নিদ্রাহীন কেটেছে ভাস্করের রাত্রি। কাছে এসে দাঁড়ান ভাস্কর সিংহ।

ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে আসে পূর্বগগনের ললাট। সেই দিকে তাকিয়ে ভাস্কর বলেন।

—আর দুই প্রহরের মধ্যে আমাদের যাত্রা করতে হবে বন্ধু।

—বিপুল পিপাসিত অন্তরে আমি সেই মুহূর্তের জন্যই অপেক্ষা করছি। শান্ত দৃষ্টি তুলে চান রঘুনাথ।

—তুমি কি সারারাত ঘুমাও নি ?—আন্তরিকতার সঙ্গে প্রশ্ন করেন ভাস্কর সিংহ।

—না ঘুম আসে নি, তুমি ?

—না ঘুম আসে নি।

পরিপূর্ণ প্রভাতের লগ্ন আসন্ন হয়ে আসে। রঘুনাথ ও ভাস্কর রামু সর্দারের অতিথি বাটীকার দিকে এগিয়ে যান। আরো দুই প্রহর অতিক্রান্ত হলে সর্দার রামু চুনারের বিশাল সাঁওতাল বাহিনী উত্তর আকাশের নীল আকাশ লাল ধূলিতে ভরে দিয়ে প্রদ্যুম্নপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। রঘুনাথ ও ভাস্কর একটি ছোট অশ্ববাহিনী নিয়ে এগিয়ে যান।

সেই সময় বনানী অতিক্রম করে এগিয়ে আসে একটিমাত্র অশ্বারোহী। দীর্ঘ পথ অশ্বচালনা করে সে ক্লান্ত।

এই ব্যক্তি পঞ্চানন ঘোষাল প্রেরিত রঘুনাথের সন্ধানকারী এক বিশ্বস্ত সৈনিক। সমস্ত সংবাদ অবগত হয়ে সেই সৈনিককে পশ্চাৎ অনুসরণকারী বাহিনীর সঙ্গে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য পাঠিয়ে দেন রঘুনাথ।

অগ্রবর্তী বাহিনী নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হন রঘুনাথ।

মধ্যাদিনের আকাশ ধীরে ধীরে তাম্রাভ হয়ে ওঠে।

ঊষর টিলাবেষ্টিত প্রান্তর অতিক্রম করে অরণ্যে প্রবেশ করে বাহিনী। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে চান না রঘুনাথ। সমস্ত সাঁওতাল বাহিনীকে কয়েকটি দলে ভাগ করে আগু পিছু সৈন্য সজ্জা করে এগুচ্ছেন তিনি।

মোটামুটি একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই। মনে মনে হিসাব করে আশা করছিলেন, পিতা পঞ্চানন ঘোষাল ইতিমধ্যে যোতবিহার ও প্রদ্যুম্নপুরে প্রচার সুরু করেছেন। যদি সঠিক সাহায্য পাওয়া যায় তবে কাল প্রত্যুষে লাউগ্রামের পশ্চিম অরণ্যে গোপনে সমবেত হয়ে পরিকল্পনা সমাধা করতে হবে।

শিঙা বেজে উঠলো।

দাঁড়িয়ে পড়লেন রঘুনাথ। ভাস্করের নির্দেশে মধ্যাহ্ন ভোজনের প্রয়োজনে অশ্ব থেকে নেমে পড়লেন সবাই। অশ্বগুলি তরুকাণ্ডে বেঁধে দিয়ে ইতি-উতি বিশ্রামার্থে উপবেশন করে সৈন্যবাহিনী।

ভারপ্রাপ্ত সৈনিকেরা ভোজ্যবাহী অশ্বগুলির পৃষ্ঠ থেকে সামগ্রী নামিয়ে রন্ধনের কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে ভাস্করের কাছে এগিয়ে আসেন রঘুনাথ। ভাস্করের বুকের আগুনের ছোঁয়া লাগে তাঁর বুকে। নিজের অন্তরে অনুভূত এক চাঞ্চল্য অনুভব করেন রঘুনাথ। সমদুঃখভাগী বান্ধবের মত ব্যথিত দৃষ্টি তুলে প্রশ্ন করেন রঘুনাথ।

—কি ভাবছ ভাস্কর ?

—বোধহয় তুমিও যা ভাবছ। স্মিতহাস্যে উত্তর দেন ভাস্কর

—আমি রাজপ্রাসাদের কথাই ভাবছি।

—আমিও।

পত্রচ্ছদ এক বৃক্ষের নীচে দূর্বামঞ্জরীর উপর দেহ এলিয়ে দেন রঘুনাথ, বুঝতে পারেন দুর্বহ এক বেদনা যেন তাঁর অন্তরের গভীরে পুঞ্জীভূত হ'য়ে র'য়েছে।

নিবিড়তর হয় মধ্যাহ্ন। অলস বাতাস তরুক্ষীর সৌরভে মূর্চ্ছিত হয়। সৈন্যগণ মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করে ইতিমধ্যে প্রস্তুত হয়।

শিঙা বাজে।

যাত্রা করে সৈন্য বাহিনী।

হঠাৎ শোনা যায় আকাশচারী পাখিদের কলরব, ভীতত্রস্ত পাখিগুলি উড়ে যায় বৃক্ষান্তরে।

সন্ধ্যাতারা ফোটে। আকাশ খর নীল। অগ্রবর্তী বাহিনী নিয়ে বনপ্রান্তে ক্ষীণ স্রোতস্বিনীর কিনারে এসে দাঁড়ান রঘুনাথ। এখান থেকে লাউগ্রাম দুই যোজন পথ। এখানেই বাহিনীকে থামিয়ে দেন রঘুনাথ। ধীরে ধীরে অগণিত সাঁওতাল সৈন্য বাহিনী একত্রিত হয়। অঙ্গদ ও সর্দার রামু চুনারের নেতৃত্বে সৈন্যগণকে এখানেই অপেক্ষা করতে বলে ভাস্কর ও রঘুনাথ লাউগ্রামে পঞ্চানন ঘোষালের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে অশ্বারূঢ় হন। অরণ্য ছায়ায় কালো একটা রেখার মত দাঁড়িয়ে থাকে সাঁওতাল বাহিনী।

ধীরে ধীরে রাত্রি গভীর হয়ে আসে।

রাত্রির আকাশ বড় স্থির ; ভয়ানক শান্ত।

দ্বার উন্মুক্ত ক'রে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বেরিয়ে এলেন পঞ্চানন ঘোষাল। তাঁর পিছনে যোতবিহারের দুইজন প্রাক্তন রাজকর্মচারী।

এগিয়ে এসে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করেন রঘুনাথ। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন পঞ্চানন ঘোষাল ; পরমুহূর্তেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন রঘুনাথকে।

—শোন,—অন্ধকারে গাঢ় শোনা যায় পঞ্চানন ঘোষালের কণ্ঠস্বর।

—"তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি। শেষ প্রস্তুত।"

—রাজপ্রাসাদের কোন সংবাদ অবগত আছেন?—এগিয়ে এসে ব্যাকুল প্রশ্ন করেন ভাস্কর।

—প্রাসাদ কংসারীর অধীনে। সারা রাজ্যে প্রচার করা হয়েছে রাজা নৃসিংহদেব উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন। কাল গোধূলি লগ্নে রাজমহিষীর উদ্যোগে রাজকন্যার সঙ্গে কংসারীর বিবাহ। অকস্মাৎ গলা চড়িয়ে বলেন :—কিন্তু রাজার

কিম্বা রাজমহিষীর এতাদৃশ্য সিদ্ধান্তের কথা কেউ বিশ্বাস করেনি, রাজার কিম্বা রাজমহিষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কেউ প্রাসাদে প্রবেশ করতে পারছেন না।

—পিতা আমি কজঙ্গলের সাঁওতাল সর্দার রামু চুনারের সাহায্য পেয়েছি; এক বিশাল সাঁওতাল বাহিনী নিয়ে সে আমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। উত্তর সীমান্তে স্রোতস্বিনীর উপান্তের অরণ্যে তারা অপেক্ষা করছে। আপনি কি করতে বলেন জানতে এসেছি। আপনার আদেশ নিতে এসেছি।

রঘুনাথের কথা শুনে উদ্বেলিত আবেগে চঞ্চল হয়ে ওঠেন পঞ্চানন ঘোষাল। বলেন।

—তুমি ধন্য রঘুনাথ। তবে ভেবনা সারা প্রদ্যুম্নপুর রাজ্যটা ঠাণ্ডা আছে। তা নয়। জল যখন ফোটে তখন নীচের দিকেই প্রথমে ফুট ধরে। তোমার সঙ্গে থাকবে প্রত্যেক প্রজা। প্রত্যেকটি পর্ণ কুটির হবে তোমার দুর্গ।

বলতে বলতে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন পঞ্চানন ঘোষাল।

গলার স্বর কাঁপে, আবার বলেন—আমি আশীর্বাদ করি রঘুনাথ তুমি জয়যুক্ত হবে।

ভাস্করের দিকে ফিরে চান রঘুনাথ। তারপর পঞ্চানন ঘোষালের দিকে ফিরে বলেন।—কাল প্রত্যুষে আমরা প্রদ্যুম্নপুর আক্রমণ করব পিতা।

রঘুনাথের কথা শুনে এক আত্মপ্রত্যয়ের তৃপ্তিতে প্রদীপ্ত হয় পঞ্চানন ঘোষালের মুখমণ্ডল।

—'শুভস্য শীঘ্রম্।' আজ রাত্রের মধ্যেই যোতবিহার থেকে প্রদ্যুম্নপুর পর্যন্ত স্বপক্ষীয় অমাত্যগণকে এ সংবাদ পেঁছে দিয়ে প্রস্তুতির আহ্বান জানানোর ভার আমি নিলাম। তুমি রাত্রির শেষ যামে যোতবিহারের উপর দুর্বার আক্রমণ হানবে। যোতবিহারের অনিবার্য পতনে তোমার পথ চেয়ে থাকা সৈন্যগণ, রাজকর্মচারীগণ সাহায্য করবে। অতঃপর পূর্ণ শক্তি দিয়ে সাঁওতাল বাহিনীসহ প্রদ্যুম্নপুর রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করবে।

—আশীর্বাদ করুন পিতা—পুনরায় আভূমি নত হয়ে প্রণাম করেন রঘুনাথ।

রাতের অন্ধকারে রণাশ্বের মুখরজ্জু আকর্ষণ করে অশ্বারূঢ় হন রঘুনাথ। ভাস্কর সিংহও তাঁকে অনুসরণ করেন। দূরান্তের ঘন অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যান দুই অশ্বারোহী।

রাত্রি শেষের আদ্র বাতাস প্রদ্যুম্নপুর প্রাসাদ দুর্গে শন্ শন্ শব্দ তোলে। চকিত হয়ে ওঠে সতর্ক প্রহরী। কিসের শব্দ না?

কারো চীৎকার? দক্ষিণে বামে চেয়ে দেখল রক্ষী। কারা প্রাচীরের গায়ে

একটা মশাল এখনও জ্বলছিল। তার আলোয় যতদূর দেখা যায় কোথাও কিছু নেই।

আবার সেই চীৎকার।

এবার নিশ্চিন্ত হল রক্ষী। কারাকক্ষের মধ্য হতে চীৎকার শোনা যাচ্ছে।

আবেগে উত্তেজনায় শৃঙ্খলিত মহারাজ নৃসিংহদেব হাতে পায়ের শৃঙ্খল বাজিয়ে কারাকক্ষে পদচারণা করে বেড়াচ্ছেন। শৃঙ্খলিত অবসন্ন পায়ের একটানা ঝনৎকার বন্ধ করে চীৎকার করে ওঠেন। পাষাণ কক্ষের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে কেমন একটা অস্বস্তিকর অমানুষিক রূপ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে সেই কণ্ঠধ্বনি।

ঊর্ধ্বলোক থেকে মৃদু আলোকের জ্যোতিধারা প্রদ্যুম্নপুরের রাজপ্রাসাদের উপর, মন্দির চূড়ায় তৃণাণ্ডিত প্রান্তরের উপর আলোকের করুণা বর্ষণ করে। যেন বিরাট এক কল্যাণের যাজ্ঞিক আবিভূর্ত হচ্ছেন।

কারাগারের লৌহদ্বার প্রান্তের ছিদ্রপথে দৃষ্টি মেলে দিয়ে দেখতে থাকেন নৃসিংহদেব। এই সামান্য ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যতদূর দৃষ্টি চালনা করা যায় তার সীমার মধ্যে পশ্চিম প্রান্তের একটি চত্বরের তৃণ মুক্ত করে চতুষ্কোণ একটি ক্ষেত্র তৈরী করে তার উপর বালি ছিটিয়ে কিছু একটা করছে সৈন্যদল ; কংসারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তদারক করছে।

কি হচ্ছে ওখানে ?

সহসা তীব্র সুরে শিঙা বেজে উঠল। নিস্তব্ধ হয়ে গেল চতুর্দিক। রাজা নৃসিংহদেব কারাগারের লৌহ কপাটের ছিদ্রপথে চোখ নিবদ্ধ করে দেখলেন সেই বালুকা বিছানো চত্বরের চারিপার্শ্বে কংসারীর পাশে তার অনুগামীগণ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর একদিকে দাঁড়িয়ে আছে দুর্গরক্ষীবাহিনী।

দুইজন রক্ষী সেই চত্বরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

সেনাপতি কংসারীর চীৎকার শোনা গেল।

—এই প্রহরীরা দেখেছে ইতিপূর্বে একজন প্রহরীকে রাতের অন্ধকারে গুপ্ত-হত্যা করা হয়েছে। তোমরা কি হত্যাকারীর শাস্তি চাও।

—চাই, চাই—সমস্বরে চীৎকার করে ওঠে উপস্থিত সকলে।

—বন্দীকে নিয়ে এসো।—চীৎকার করে আদেশ দেয় কংসারী।

সেই দ্বারের ছিদ্রপথে চক্ষু স্থাপন করে দেখলেন রাজা নৃসিংহদেব, কয়েকজন প্রহরী সান্ত্রী একজনকে সেই তৃণমুক্ত চত্বরের উপর এনে দাঁড় করিয়ে দিল, তাঁর হাত পা শৃঙ্খলিত : সে প্রমদা।

তার মাথা নীচু। মুখ অন্ধকার।

দাঁড়িয়ে থাকবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে প্রমদা।

—তুমি প্রহরীকে হত্যা করেছ ?—চীৎকার করে প্রমদাকে জিজ্ঞাসা করে কংসারী।

—কিন্তু—কিছু বলতে চায় প্রমদা।

—তুমি কি সেই প্রহরীকে হত্যা করেছ ?

পুনরায় চীৎকার করে প্রশ্ন করে কংসারী।

—হ্যাঁ,—কিন্তু

সমবেত সৈনিক ও প্রহরীদের গুঞ্জনে প্রমদার কণ্ঠস্বর শোনা গেল না।

ঘাতক বিশাল একটি খড়্গ কাঁধে নিয়ে সেই মশানে প্রবেশ করল। প্রমদাকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরতে লাগল সেই ঘাতক। বালির উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রমদা। তার সামনে রাজপ্রাসাদের সারিবদ্ধ স্তম্ভ শ্রেণী। দূরে ঘন পত্রচ্ছদ সবুজ বৃক্ষশ্রেণী। উপরে আকাশের অনন্ত নীলিমা সমস্তই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে চোখের জলে।

ততক্ষণে ঘাতক তার পশ্চাতে গিয়ে দাঁড়াল।

কংসারীর আদেশে একজন সৈনিক এগিয়ে গিয়ে প্রমদার দুই নিবিড় নয়নে একখণ্ড কৃষ্ণ বস্ত্র বন্ধন করে দিয়ে স্তবকিত কেশদাম পশ্চাৎভাগ থেকে টেনে মাথার উপর চূড়া করে বেঁধে দিয়ে আসে।

—মাটি ছুঁয়ে বল তুমি অপরাধী !—চীৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছিল কংসারী।

প্রমদার কানে কোন স্বর ঢুকল না।

আবার চীৎকার করে উঠলো কংসারী—

এবার মাথা নীচু করে বালি বিছানো চত্বর স্পর্শ করল প্রমদা।

অনুচ্চ কণ্ঠে বলল।

—আমি নির্দোষ আমি······

সেই মুহূর্তে তার মাথার উপর খড়্গ ঝলসে উঠলো।

সূর্য কিরণে অবগাহন করে তীব্র বেগে নেমে এল প্রমদার কোমল স্কন্ধে। বালুকা রাশির উপর ছিটকে পড়ল প্রমদার খণ্ডিত মস্তক। স্তবকিত কেশদাম খুলে গিয়ে ঢেকে ফেলল স্বপ্নীল ঠোঁট, বিস্ফারিত সাকাঙ্ক্ষ ওষ্ঠ। রক্তমাখা খড়্গ শূন্যে তুলে সেনাপতিকে অভিবাদন করল ঘাতক।

—না—না—

কারা কক্ষ বিদীর্ণ করে চীৎকার করে উঠলেন শৃঙ্খলিত রাজা নৃসিংহদেব। সজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়লেন পাষাণ কারার পাষাণ বেদীতে।

দূরে প্রদ্যুম্নপুর রাজ্য সীমান্তে স্রোতস্বিনীর তটে পশ্চিমাকাশের একখন্ড

মেঘ সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকে নীচে বালুকা তটের উপর তার বহুদিনের ফেলে যাওয়া আবাল্য সাথীর দিকে।

শুকতারার আলোকে রাত্রিশেষের হিমেল অন্ধকার যখন স্থির তখন মৃগয়াজীব ব্যাধের মত সাঁওতাল বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল যোতবিহারের রাজপ্রাসাদে। অপ্রস্তুত রক্ষীবাহিনী এই হঠাৎ আক্রমণে পিছু হটতে বাধ্য হয়ে প্রাসাদের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। শেষ রাতের মৃদু আলোকে জ্বলে ওঠে অগ্নি-সায়ক। পথ পেয়ে রঘুনাথ সসৈন্যে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করেন।

সৈন্যদের চীৎকার শোনা যায়।

—জয় রাজা রঘুনাথের জয়।

মহীরাম প্রাসাদের উপর থেকে নামতে চেষ্টা করে। চেয়ে দেখে প্রাসাদটা যেন পরিহাস করে তারই দিকেই চেয়ে আছে।

—খবরদার।

সোপানশ্রেণীর নীচে মুক্ত তরবারি হাতে রঘুনাথ। রঘুনাথের সঙ্গে ইতিমধ্যেই প্রাসাদরক্ষীরা যোগ দিয়েছে।

মহীরামের চোখ লাল হয়ে ওঠে। অপমানে জ্বলে ওঠে সে। তরবারি উন্মুক্ত করে ছুটে নামতে চায় মহীরাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে এক ঝাঁক তীর তার বক্ষভেদ করে।

সোপান শ্রেণীর উপর থেকে মহীরামের রক্তাক্ত দেহটা গড়িয়ে পড়ে নীচে রঘুনাথের পায়ের কাছে।

প্রাসাদের তোরণদ্বার খুলে গিয়েছে।

দলে দলে সৈন্যবাহিনী প্রাসাদ চত্বরে সমবেত হয়।

ইতিমধ্যে পঞ্চানন ঘোষালও উপস্থিত হন। উল্লাসে চীৎকার করে ওঠে উৎফুল্ল সৈন্যবাহিনী।

—জয় রাজা রঘুনাথের জয়।

প্রভাত সূর্যালোকে আলিম্পিত হয় যোতবিহার রাজপ্রাসাদ। বহুদিন পর নিজ শয়ন কক্ষের মধ্যে দাঁড়িয়ে ক্ষণেকের জন্য নিজের অন্তরের ভিতরে এক দাবদগ্ধ জ্বালা অনুভব করেন রঘুনাথ। প্রভাত বায়ুর মৃদু শীত সঞ্চালনে ধীরে ধীরে আবার শান্ত হয় হৃদয়। শুনতে পান সেই মঞ্জীর ধ্বনি তাঁর নিঃশ্বাস আর অতৃপ্ত অধর অনন্ত কাল যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দুটি প্রণয়োৎসুক বাহু বক্ষে স্থাপন করে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেন রঘুনাথ—"প্রদ্যুম্নপুর তনয়া চন্দ্রকুমারী।"

—হ্যাঁ। প্রদ্যুম্নপুর রাজপ্রাসাদে তোমার ঐ মত্ত তপ্ত দুই বাহুর কামনা

ধরাশ্রিত নখবিলিখনে আলিম্পিত হবার কামনায় তোমারই প্রণয়কামিনী সেই তাপসীকার বিবশ তনু আজও স্বপ্নাতুর।

—কে ভাস্কর। ভাস্করের উপস্থিতিতে অন্যমনস্ক রঘুনাথ চমকে ওঠেন।

—হ্যাঁ আমি। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন ভাস্কর তারপর অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠেন।—তোমাকে বলতে দ্বিধা নেই রঘুনাথ, প্রমদার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে। জানি না কংসারীর হাত কতদূর অগ্রসর হয়েছে।

—কংসারী! শৃগাল আর হায়নার দলের সর্দার হয়ে অনেক দিন জেগে আছে সে, এবার তার ঘুমের পালা, সে ঘুম আর ভাঙ্গবে না। ধীরে ধীরে কথা কয়টি উচ্চারণ করে ভাস্করের দিকে এগিয়ে এলেন রঘুনাথ। আবার প্রশ্ন করলেন।

—সৈন্যদল প্রস্তুত?

—হ্যাঁ প্রস্তুত।

প্রাসাদ শিখর হতে সশস্ত্র রঘুনাথ নেমে এলেন।

তাঁকে দেখে সমবেত সৈন্যবাহিনী চীৎকার করে উঠল।

—জয় রাজা রঘুনাথের জয়।

এক মুহূর্তও কালক্ষেপ করলেন না রঘুনাথ। রণাশ্বের মুখে রজ্জু যোজিত করে প্রস্তুত রেখেছিল অশ্বরক্ষক। অশ্বারূঢ় হলেন রঘুনাথ। প্রান্তর ভেদ করে প্রদ্যুম্নপুর অভিমুখে ছুটে চললেন।

নীলাকাশ ধূলিতে ভরে দিয়ে এগিয়ে চলে সৈন্যদল, তাদের বর্শার ফলায়, শাণিত তরবারিতে রৌদ্রকরণিকর ঝলসে ওঠে।

সেই সময়। প্রদ্যুম্নপুর রাজপ্রাসাদে প্রমদা-হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত করে রক্তাভ চক্ষুতে অবজ্ঞা নিয়ে কংসারী সমবেত কর্মীদের বিবাহ-আয়োজনের জন্য কর্তব্য ভাগ করে দিল।

দুর্গদ্বারে প্রহরা সুকঠিন করে কুৎসিত লালসাসিক্ত অধর প্রান্তে বাঁকা হাসি ফুটিয়ে রাণী মহলে এসে দাঁড়াল।

দুর্গশীর্ষে নহবত বেজে উঠল।

অবিন্যস্ত পর্যঙ্কের উপর উঠে বসল চন্দ্রকুমারী। শুধু কান দিয়ে নয় সমগ্র সত্তা দিয়ে শুনতে লাগল নহবতের ধ্বনি। নিবিড় কৃষ্ণপক্ষ্মসেবিত দুই নয়নের তারকার কৌতূহল রাজমহিষী সনকার উপর ন্যস্ত করে প্রশ্ন করে।

ও কিসের সুরধ্বনি মা।

জানি না, অনুমান করতে পারি। শিহরিত হৃদয়ে বিপুল আবেগে কন্যার মস্তক নিজ বক্ষে চেপে ধরেন রাণী সনকা।

—কি অনুমান করছ মা আমাকে বল।—সন্ত্রস্ত দুই মৃণাল বাহুতে মাতৃকণ্ঠ বেষ্টন করে চন্দ্রকুমারী।

সহসা দ্বার খুলে যায়। সভয়ে দেখতে পান রাণী সনকা ও রাজ তনয়া চন্দ্রকুমারী, লালসামূঢ় কামান্ধের চক্ষু নিয়ে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সেনাপতি কংসারী।

—কি চাও?—প্রশ্ন করেন রাণী সনকা, তাঁর কণ্ঠস্বর কেঁপে যায়।

—আপনার কন্যাকে।—সতৃষ্ণ ক্ষুধাতুর দৃষ্টি মেলে চন্দ্রকুমারীর দিকে তাকায় কংসারী।

—এ কথার অর্থ। নিজের মনে শক্তি সঞ্চয়নের উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই আবারো প্রশ্ন করেন রাণী সনকা।

—অর্থ আপনার জানা আছে। আমি আজ আপনার কন্যাকে বিবাহ করব। রাজ অন্তঃপুরে তার প্রস্তুতি প্রায় সমাপ্ত। কেবল আপনার কন্যাকে বধূবেশে সাজিয়ে নেওয়ার অপেক্ষা।

—কি বললে।—রাণীর ভ্রূরেখা বিস্ময়ে শিহরিত হয়।

—হ্যাঁ রাজমহিষী। আমাকে বলপ্রয়োগে বাধ্য করে বিবাহোৎসবে বিঘ্ন ঘটাবেন না। আসুন রাজকন্যা। কংসারী দ্বার অতিক্রম করে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে।

—দাঁড়াও। চীৎকার করে ওঠে চন্দ্রকুমারী। পরক্ষণেই মুহূর্তিক মুক্তির আশায় আবার বলে—আমাকে সাজিয়ে দেবার জন্য সখী প্রমদাকে পাঠিয়ে দাও।

মৃত চিতার মত বোবা দৃষ্টি তুলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল কংসারী পরমুহূর্তেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

—প্রমদা? তাকে কোথায় পাবে রাজকন্যা? সে অনেক দূরে। টেনে টেনে হাসতে হাসতে বলে কংসারী।

—কোথায় সে। আবার প্রশ্ন করে চন্দ্রকুমারী।

কংসারীর চোয়াল দুটো একবার শক্ত হয়ে উঠেই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। কুৎসিত একটা হাসিতে হরিদ্রাভ দাঁতগুলি দেখা দিল লালাসিক্ত ঠোঁটের ফাঁকে। হাসতে হাসতেই বলে।—প্রমদার জন্য চিন্তিত হয়ে লাভ নেই রাজকন্যা। তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সে কিংকরী আর তুমি রাজকন্যা আমার কাছে তুমি অনেক মূল্যবান। তোমায় কি আমি যার তার হাতে ছেড়ে দিতে পারি?

—এক পা এক পা করে কংসারী এগুতে থাকে আর একপা একপা করে পিছু হটতে থাকে চন্দ্রকুমারী।

কংসারী দেখছে তাজা রক্ত মাংসের সমারোহ, চন্দ্রকুমারী দেখছে একটা হিংস্র ক্ষুধিত নেকড়ে।

হঠাৎ।

হঠাৎ তীব্র কোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে রাজপ্রসাদ। তীক্ষ্ণ শব্দে দুর্গতোরণে ভেরী বেজে ওঠে। ছুটে আসে বার্তাবাহী।

কংসারী ঘুরে দাঁড়ায়।

—প্রাসাদ আক্রান্ত মহামান্য সেনাপতি। বার্তা নিবেদন ক'রে হাঁপাতে থাকে বার্তাবাহী।

—কে? কার এত দুঃসাহস? কামনার বিষে টগবগ করা ফুটন্ত রক্ত বুকে নিয়ে দ্রুত ছুটে যায় কংসারী।

দুই চক্ষু মুদ্রিত করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চন্দ্রকুমারী। ব্যথিত দুই চক্ষু হতে ছিন্ন মণিসরের মত অশ্রুর ধারা কক্ষতলে লুটিয়ে পড়ে।

বাতায়নে ছুটে যান রাজমহিষী সনকা। তীব্র কোলাহলে রাজপ্রাসাদ বেষ্টন করে আক্রমণ সূচিত হয়েছে।

দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দিয়ে স্তব্ধ সঙ্গীতের মত সাকাঙ্ক্ষ স্বরে বলতে থাকেন রাণী সনকা।

—তুমি যেই হও, তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর, তুমি জয়ী হও।'

—যে ভাবেই হোক প্রাসাদ দুর্গে প্রবেশ করতেই হবে। চীৎকার করে আদেশ দেন রঘুনাথ। সৈন্যদল অগ্রসর হতেই দুর্গরক্ষীদল এগিয়ে আসে। দু একটা অশ্ব তীর বিদ্ধ হয়ে মরীয়া হয়ে দৌড়ায়। একটু অগ্রসর হয়েই ছিটকে পড়ে। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর নিক্ষেপ করে রঘুনাথের সাঁওতাল বাহিনী।

বিপর্যস্ত ক্ষত বিক্ষত দুর্গরক্ষীবাহিনী পিছু হ'টে দুর্গে আশ্রয় নেয়।

সৈন্যদলকে দুইভাগে ভাগ করে দুর্গের দুই দিক থেকে আক্রমণের পরিকল্পনা করে সম্মুখ ভাগের আক্রমণের দায়িত্ব ভাস্কর ও অঙ্গদের উপর দিয়ে নিজে দুর্গের পশ্চাত ভাগ থেকে দুর্বার বেগে আক্রমণ হানেন রঘুনাথ।

দুর্গ শীর্ষে কংসারীর তীরন্দাজ বাহিনী সারিবদ্ধ হয়ে তীর নিক্ষেপ করে। বাধা পেয়ে মারমুখী হয়ে ওঠে রামু সর্দার। অগণিত সাঁওতাল তীরন্দাজ শত্রুদের প্রবল বেগে আক্রমণ করে। দুর্গশীর্ষ থেকে গড়িয়ে পড়ে প্রাণহীন দেহ। দ্রুতগীতিতে এগিয়ে যায় রামু সর্দার দুর্গ প্রাকারের কাছে।

ওদিকে রক্ত স্নানে মেতে ওঠেন রঘুনাথ। তাঁর উন্মুক্ত তরবারির আঘাতে শত্রুর শির ছিটকে পড়ছে। পশ্চাৎ দুর্গের অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ প্রাকারে ইতিমধ্যে রজ্জু আকর্ষণ করে উঠে পড়ে কিছু সাঁওতাল সৈনিক।

এবার পূর্ণ বেগে হানা দেয় তারা।

সহসা দুর্গের তোরণ ভেঙ্গে পড়ে। কয়েক শত সৈন্যের চীৎকারে আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে।

দুর্গ তোরণে বয়ে যায় রক্তের বন্যা।

ক্লান্ত বিজয়ী ভাস্কর দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করেন।

মানুষের আওয়াজ পাওয়া বুনো জানোয়ারের মত চমকে ওঠে কংসারী। দ্রুত সে ছুটে আসে রাণী মহলে।

তাড়া খাওয়া হরিণীর মত পিছু হটতে হটতে চন্দ্রকুমারী যেখানে এসে দাঁড়াল সেখানে আর পিছবার স্থান নেই।

মরীয়া হয়ে উঠেছে কংসারী। হাতের মুঠোয় এসে কোন কিছুই তার ফসকে যায়নি জীবনে। চীৎকার করে উঠলো কংসারী।

—এখনও সময় আছে। রাজমাতাকে ডেকে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে প্রচার কর তুমি আমার বাগদত্তা, আমি এ রাজ্যের ভাবী রাজা।

—না। আকুল বিশ্বাসে চন্দ্রকুমারী চীৎকার করে উঠলো।

—তোমার দিন শেষ হয়ে এসেছে কংসারী।

কুৎসিত ক্রোধে অন্ধ হয়ে নেকড়ের মত ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে এলো কংসারী। তার ভুজ-ভুজঙ্গমের আকর্ষণে জালে পড়া অসহায় পাখির মত বিহ্বল আতঙ্কে চন্দ্রকুমারী চীৎকার করে উঠলো—বাঁচাও, কে আছ বাঁচাও—

মরণান্তিক যন্ত্রণায় আর ঘৃণায় চন্দ্রকুমারী দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে কেঁদে উঠলো, বিশ্বাসের প্রচণ্ড আকুলতায় আর একবার চীৎকার করে ডাকল,

—'রঘুনাথ'। পরক্ষণেই উদ্গত কান্নায় ভেঙে পড়ে রাজকন্যা চন্দ্রকুমারী।

সহসা শিকার লোলুপ নেকড়ের মতই এক ছায়ামূর্তি লাফিয়ে পড়ল কংসারীর উপর।

সকলে তাকিয়ে দেখল। সত্যই রঘুনাথ সেখানে দাঁড়িয়ে।

তাঁর হাতের কশা সশব্দে গিয়ে পড়ল কংসারীর মুখের উপর। রক্তাক্ত মুখে বীভৎস চীৎকার করে উঠলো কংসারী। চোখের নিমেষে তরবারি টেনে বার করে কংসারী। কিন্তু রঘুনাথের বলদর্পিত বাহু মুহূর্তের মধ্যে কংসারীর বক্ষ ভেদ করে তরবারি গ্রথিত করে দিল। উপুড় হয়ে পড়ল কংসারী। আর একটা রক্তের ধারা কক্ষতল সিক্ত করে দিল।

ঘুরে দাঁড়ালেন রঘুনাথ।

আস্তে আস্তে ওঠে চন্দ্রকুমারী।

সুপক্ষ্মল দু'টি নয়নের কজ্জল গণ্ডে লেগেছে, নীচের ওষ্ঠপুটে রক্তাভা, শুভ্র চিনাংশুক ছিন্ন ভিন্ন, তারই ফাঁকে ফাঁকে নখের আঁচড়ের লাল দাগ। ক্লান্ত নিঃশ্বাসে আহত কুররীর মত করুণস্বরে যেন আর্তনাদ করে ওঠে চন্দ্রকুমারী।

—প্রিয়তম।

অকস্মাৎ যেন দৃষ্টিহারা হয়ে যায় রঘুনাথের উৎফুল্ল নয়ন। ঐ একটি

আহ্বানের ধ্বনি শুনেই কয়েক মুহূর্ত শুধু কি যেন চিন্তা করেন রঘুনাথ তার পরেই চন্দ্রকুমারীর কাছে এগিয়ে আসেন রঘুনাথ। উৎসুক প্রণয়ীর মত চন্দ্রকুমারীর স্তবকিত কুন্তল স্পর্শ করে আহ্বান করেন।

—প্রিয়া চন্দ্রকুমারী।

রঘুনাথের আহ্বান চন্দ্রকুমারীর হৃদয়ের ভাষা ভুলিয়ে দেয়। লাল রক্ত কণিকার দলকে তাড়িত করে নিয়ে যায় মুখে। রাজতনয়ার ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য যেন বর্শার ফলার মত রঘুনাথের বুকের ভিতরের নিঃশ্বাসবায়ু বিদ্ধ করছে। তাঁর বিমুগ্ধ দৃষ্টি বিদ্যুতের মত চন্দ্রকুমারীর উপর ঝলসে উঠল। কোন অদৃশ্য শক্তির শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে যায় চন্দ্রকুমারীর দুই পা। আনন্দের আতিশয্যে আচ্ছন্ন এণলোচন মুদ্রিত করে মৃদুস্বরে বলে।

—এতদিন দুঃসহ প্রতীক্ষায় ছিলাম। আজ পেয়েছি তোমায়। প্রদ্যুম্নপুর রাজতনয়ার জীবনের একমাত্র অলঙ্কার তুমি।

—প্রিয়া চন্দ্রকুমারী।—রঘুনাথ আহ্বান করেন।

সেই মুহূর্তে অকস্মাৎ মুখর হয়ে ওঠে রাজনিকেতন।

সৈন্যগণের চীৎকারে প্রকম্পিত হয় বাতাস।

—'জয় মহারাজ নৃসিংহদেবের জয়'।

ত্বরিতে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে প্রাঙ্গণে বেরিয়ে আসেন রঘুনাথ, রাণী সনকা, রাজকুমারী চন্দ্র।

রঘুনাথের দুই চক্ষুর দৃষ্টি রাজা নৃসিংহদেবের মুখের দিকে ছুটে যায়। তাঁর সারা দেহ কেঁপে উঠল। হঠাৎ নিজের উপর বৃদ্ধ রাজার দৃষ্টি অনুভব করেন রঘুনাথ। সে কি দৃষ্টি, লুব্ধ, বিদ্বিষ্ট, অসূয়া-হিম সে দৃষ্টি।

রঘুনাথ ছুটে গেলেন রাজার কাছে।

চীৎকার করে উঠলেন রাজা নৃসিংহদেব।

—না-না আমি তোমাকে ক্ষমা করব না। আমার কন্যাকে তুমিই না প্রত্যাখান করেছিলে?

বৃদ্ধ নৃসিংহদেবের কণ্ঠস্বর আবেগের টানে বুঝি ছিঁড়ে যাচ্ছে, অন্তরের ঝড়ে হৃদয়টা উড়ে যাচ্ছে। উপরের ঠোঁট কাঁপছে ঘন ঘন।

—আমাকে ক্ষমা করুন পিতা।

—পুত্র আমার।

রঘুনাথের দিকে চেয়ে বিহ্বল চীৎকার করে ওঠেন রাজা নৃসিংহদেব। পরক্ষণে বিপুল আবেগে রঘুনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন ভাস্কর। কারাগার থেকে তিনিই মুক্ত করেছিলেন রাজা নৃসিংহদেবকে।

—পিতা।

মৃদু স্বরে আহ্বান করে ভাস্কর সিংহ।

ঝুঁকে পড়ে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন রাজা নৃসিংহদেব। তাঁর দু'চোখ যেন নিভে গিয়েছে। সেই নেভা দৃষ্টিতে ভাস্করকে যেন স্পর্শ করতে চাইলেন। পরক্ষণেই ভাস্করের হাত চেপে ধরলেন, যেন নিজের বুকের উপর জমা ভারটার টাল সামলাতে চাইলেন। মুহূর্তের মধ্যে বিহ্বলতায় যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। চীৎকার ক'রে উঠলেন।

—পালিয়ে যাও—কিছু জিজ্ঞাসা কোরনা আমায়।

—পিতা। ছুটে আসে চন্দ্রকুমারী।

—ওরে পালিয়ে যা, এখনি হৃদয় চোখের জলে গ'লে গ'লে পড়বে। না-না—আমিই পালাই।

দৃষ্টিকে সন্ধানী আলোর মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কি যেন দেখতে চাইলেন। রাজা নৃসিহদেবের অসংযত পদক্ষেপ তাঁকে উন্মত্ততার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যেন কোন বিস্মৃতি থেকে, দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠতে চাইছেন তিনি।

তাঁর চোখের পাতা ধীরে ধীরে বুজে এল, সারা মুখ একটা অনির্দিষ্ট সহ্যাতীত যন্ত্রণায় এলোমেলো বেগে বেঁকেচুরে গেল। হাতে দু'চোখ ঢেকে বুকফাটা একটা চীৎকার করে উঠলেন তিনি।

—প্রমদা।

সেই চীৎকার শুনে বায়ুতাড়িত পাতার মত কেঁপে উঠলেন ভাস্কর তাঁর মন ফিস্ ফিস্ করে উঠলো প্রমদা,—কোথায় প্রমদা ?

প্রমদার অনুপস্থিতি এবার নতুন করে যাচাই করতে গিয়ে তাঁর স্বপ্ন ভেঙে পড়ল। কিন্তু ভগ্নাবশেষের উপর কোন সৌধ নির্মিত হল না। কী যেন একটা শূন্যতা তাঁর চৈতন্যে সন্তর্পণে প্রবেশ করল।

* * *

আকাশে অজস্র নক্ষত্র। আলোক মালায় সজ্জিত সারা প্রদ্যুম্নপুর নগরী তীব্র কোলাহল মুখর। প্রাসাদ দুর্গে তূর্য বাজে। দলে দলে নরনারী শোভাযাত্রা করে নগর পরিক্রমা করে। শরৎ মেঘের স্তবকের মত প্রাসাদের শিখর-কেতন ওড়ে।

নানা মাঙ্গল্য উপাচার সাজিয়ে, সিত চন্দনে সিক্ত সহকার কিশলয়ের গুচ্ছ নিয়ে দেব মন্দিরে কৃতাঞ্জলী নিবেদন করে পুরললনা। রণরথে নগর পরিক্রমা করে প্রাসাদ দুর্গে ফেরেন অমাত্য রাজভক্ত মহামন্ত্রী আরো রাজ প্রতিনিধিগণ।

প্রাসাদাভ্যন্তরে রাজকুমারী চন্দ্রের সুভঙ্গিম ভ্রূরেখা উৎসুক্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে। ব্যস্ত হয়ে ওঠেন রাজমহিষী সনকা। অলিন্দ অতিক্রম করে বিশ্রামাগারের দিকে রাজমহিষীকে এগিয়ে আসতে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে কিংকর কিংকরীর দল। সে দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন রানী সনকা।

—কোথায়, রাজা নৃসিংহদেব কোথায়?

বিচলিতচিত্তে প্রাসাদের সর্বত্র অনুসন্ধান চলে। রাজদর্শন লাভের প্রতীক্ষায় দুই চক্ষুর উদ্‌গত অশ্রুবাষ্প ঢেকে রাখতে পারছেন না রানী সনকা।

কিন্তু একি বিস্ময়! কোথায় রাজা নৃসিংহদেব। প্রাসাদের চতুর্দিকে অনুসন্ধান করে রাজকর্মচারীগণ।

অকস্মাৎ দাবানলের মত প্রাসাদ দুর্গের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল রাজার এই হঠাৎ অন্তর্ধানের সংবাদ।

এদিকে।

রাজোদ্যানের নিভৃতে মাধবী লতিকায় মুণ্ডিত অতিথিবাটিকায় নীরব হয়ে বসেছিলেন ভাস্কর সিংহ। তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা সদাজাগ্রত একটা বিরহে অবশ হয়ে রয়েছে। এ বিরহ ভোলা যায় না,—এ ব্যাকুলতার দমন নেই। বাতাস বুঝি ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে কথা বলে, সেই প্রেম স্পর্শের মত কোমল নিঃশ্বাস বয়ে যাচ্ছে। তাঁর মুখের উপর সিক্ত নিঃশ্বাস পড়ছে, সর্বাঙ্গ আবিষ্ট করে তাঁর উত্তপ্ত গণ্ডের উপর তপ্ত অশ্রু ঝরছে কার। ওষ্ঠের উপর দীর্ঘস্থায়ী আবিষ্ট চুম্বন।

তাঁর সমস্ত জীবনটাই এই চুম্বনের নীচে অনির্বাণ জ্বালায় মুমূর্ষুর মত পড়ে রয়েছে।

কিন্তু কোথায় সে?

মনে হল তিনি গুঁড়িয়ে যাচ্ছেন, জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছেন। শেষে, অন্তিম হতাশায়, নিদারুণ চেষ্টায় চীৎকার করে উঠলেন।

—প্র-ম-দা।

মাথার মধ্যে যন্ত্রণা বোধ করলেন ভাস্কর সিংহ। চেতনা উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে একটি নিমেষে দুর্গপ্রাসাদে আজই প্রত্যূষে প্রমদা-হত্যার যে কাহিনী শ্রবণ করেছেন তার পুনরাবৃত্তি হয়ে গেল, শিউরে উঠল বুক। বুকে লাগল বিশাল দোলা। তাঁর তাপগলিত অন্তর থেকে উচ্ছল অশ্রুধারা নির্গত হতে থাকে। তাঁর কল্লোলিত হৃদয় জ্বালার প্রাবল্যে বিশ্লিষ্ট বিচূর্ণ হয়ে যেতে চায়।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন ভাস্কর সিংহ। মাথার মধ্যে ঘূর্ণি। দেহে একবার আগুনের স্রোত পরমুহূর্তেই হিমস্রোত বয়ে যাচ্ছে। হাহাকারদীর্ণ বক্ষে অতিথি-বাটীকার মাধবী লতিকা বক্ষে স্পর্শ করে বেদনার আকুলতায় গুমরে

উঠলেন। অবোধ্য উচ্চারণ প্রতিধ্বনিত করে রাজোদ্যান ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন বিশৃঙ্খল তাড়িৎ গতিতে। হঠাৎ তাঁর চোখে ঝক্‌মক্‌ করে উঠল কী একটা সংকল্প। প্রাসাদে গেলেন না ভাস্কর সিংহ।

নিজ ভবনে প্রবেশ করে মনে হল। এইতো সেদিন বর্ষণ-মুখর রাত্রির অভিসারে কুমারী জীবনের সকল আগ্রহ নিয়ে এখানেই এসেছিল প্রমদা তাঁকে বরণ করবার জন্য। মনে হয় ভাস্কর সিংহের সমস্ত অস্তিত্ব, সমগ্র সৃষ্টি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। যেন বহু সহস্র বৎসর ব্যাপী একটি সুদীর্ঘ রাত্রিতে ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

বেরিয়ে এলেন ভাস্কর সিংহ। ছুটে গিয়ে নিজ আস্তাবলে প্রবেশ করলেন এবং অশ্বের মুখে বল্গা যোজিত করে প্রস্তুত হন। পরমুহূর্তেই অশ্বারূঢ় হয়ে ছুটে চলে যান। নগরদ্বার পার হয়ে তৃণাচ্ছন্ন প্রান্তর পার হয়ে তিমিরপুঞ্জ ছিন্ন করে ভাস্কর সিংহের অশ্ব ধাবিত হয়।

রঘুনাথ নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে প্রদ্যুম্নপুর রাজনিকেতন।

মুহ্যমান নগরবাসী।

আকস্মিক ও রূঢ় আঘাতে নিষ্কম্প দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন রাণী সনকা। দাঁড়িয়ে থাকে রাজতনয়া চন্দ্রকুমারী। বিচলিত হয়ে ওঠেন মহামন্ত্রীসহ সমস্ত রাজপরিষদ। রাত্রির শিশির বাষ্প মুছে দিয়ে প্রভাত হয়েছে অনেকক্ষণ। কানাই সায়রের কাল জল থেকে মহারাজা নৃসিংহদেবের মৃতদেহ প্রাসাদে নিয়ে আসা হয়েছে অনেকক্ষণ।

সকলের অলক্ষ্যে অন্তরের জ্বালা জুড়াতে কানাই সায়রের কৃষ্ণ সলিলে আত্ম-বিসর্জন দিয়েছেন রাজা নৃসিংহদেব। তাঁর এই আত্মবিসর্জনে সারা দেশ শোকে মৃয়মান হয়ে গেল।

সূর্যের উদয়াস্তের পথের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন রাণী সনকা। তিনি যেন তাঁর অন্তরের নিভৃতে এক মহা আহ্বান শুনতে পেয়েছেন যে আহ্বানের বাণী এই জীবনের ইহকালের কানে কানে কখনও বলা যায় না। তাঁর আয়ত নয়নের দৃষ্টি মহামন্ত্রীর মুখের উপর নিবদ্ধ করে বলেন···

—আমার স্বামী মহারাজা নৃসিংহদেব মৃত্যুকে অতিক্রম করে সমাজে আর ফিরে আসবেন না। কিন্তু···

তাঁর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো। বুকের উপর একটা শ্বাসরোধ করা ভার চেপে বসতে চাইলে তিনি তা কঠিন সংকল্পে বিদ্যুৎবস্ত করে আবার বললেন—

—আমার স্বামীর প্রিয় প্রদ্যুম্নপুর আজ রাজাহীন। রাজাহীন রাজ্যে অশাসন দুঃখ অশান্তি ও উপদ্রব অনিবার্য।

আমি এই বিশৃঙ্খলা দূর করবার জন্য দায়বদ্ধ। তাই আমার একমাত্র কন্যা চন্দ্রকুমারীর বিবাহ আমি প্রদ্যুম্নপুরের উপযুক্ত রক্ষক রঘুনাথের সঙ্গে দিয়ে রঘুনাথকে এই রাজ-সিংহাসন দান করছি।

উপরে মধ্যাহ্ন সূর্য। শোকাচ্ছন্ন রাণী সনকা এবার রাজপুরোহিত অর্কদেবের দিকে ফিরে চাইলেন। রাজকীয় মহিমায় তাঁর দুই চক্ষুর দৃপ্ত দৃষ্টি তুলে বললেন।

—রাজকীয় মর্যাদায় রাজার দেহ সৎকারের ব্যবস্থা করুন দেব, আর সহমৃতা হবার জন্য উপযুক্ত বস্ত্রে, সিন্দুর-চন্দনে আমাকে এখানেই সাজিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।

আমি আর প্রাসাদে প্রবেশ করব না।

শোকে আতঙ্কে পাংশু, অশ্রু-আবেগে বেপথু চন্দ্রকুমারী উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ে।

—জয় সতীমায়ের জয়।

সমবেত চীৎকারে কেঁপে ওঠে সারা প্রদ্যুম্নপুর নগরী।

* * *

চিতানলের আলোছায়া যেন দুর্বোধ্য এক রহস্যময় রূপ নিয়ে জ্বলতে থাকে, তারই মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন রঘুনাথ। অগুরুবর্তিকা ও চন্দন গন্ধে অভিভূত বায়ুস্পর্শে তাঁর চিন্তা শিহরিত হয়। কোথায় গেলেন রাজা নৃসিংহদেব, কোথায় গেলেন রাণী সনকা? ভাবতে থাকেন রঘুনাথ। সঙ্গে সঙ্গে একটি বিষণ্ণতার ছায়া তাঁর দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে সঞ্চালিত হয়। শান্ত চিতানলের দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মনে মনে বলেন রঘুনাথ—তোমাদের প্রদত্ত দায়ভার বহনের শক্তি দাও।

অঞ্জলীপুটে গৃহীত সলিল চিতাবক্ষে নিক্ষেপ করে উঠে দাঁড়ান রঘুনাথ।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ।

প্রাসাদে প্রবেশ করে কিংকরীর মুখে চন্দ্রকুমারীর শোকবিহ্বল অস্থিরতার সংবাদ পেয়ে রাজকুমারীর কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিংকরী কক্ষদ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিল।

কক্ষে প্রবেশ করলেন রঘুনাথ। কিছু বলবার চেষ্টা করলেন, হাত রাখলেন চন্দ্রকুমারীর কাঁধে।

ফুঁপিয়ে কাঁদছে চন্দ্রকুমারী। কান্নার ঢেউয়ে ঢেউয়ে তরঙ্গিত হচ্ছে বুক।

সূর্যাস্তের আকাশের মত অরুণ বর্ণ মুখ।

রঘুনাথ রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকেন;

—চন্দ্র।

আবেগের ধাক্কায় বাক্ রোধ হয়ে যায় চন্দ্রকুমারীর। ঘনিষ্ঠ হয়ে গাঢ় আকুল আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলে রঘুনাথকে। রুদ্ধ কান্না বুক ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে।

উত্তপ্ত অশ্রু রঘুনাথের বুকের উপর ঝরে পড়তে থাকে।

চন্দ্রকুমারীর স্তবকিত কুন্তলে হাত রেখে উদ্‌ভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে রইলেন রঘুনাথ। কণ্ঠ বশে নেই তাই কথা ফুটল না। শেষে দুচোখ ভেঙে অবাধ্য অশ্রু ঝরল।

কান্না!

দুটি হৃদয় ফেটে বেরিয়ে আসতে থাকে শুধু কান্না।

প্রাসাদ কক্ষে নিষ্কম্প্র তৈলদীপ জ্বলে।

রাজোদ্যানে তরুবীথিকায় শীর্ষ চুম্বন ক'রে শিশিরস্নাত চন্দ্রিমালোক ছড়িয়ে পড়ে।

* * *

দিন যায়।

প্রদ্যুম্নপুরে আর এক গোধূলি বেলা।

সম্প্রদত্তা চন্দ্রকুমারীর আনন্দদীপ্ত আননের দিকে তাকিয়ে রাজ পুজারী অর্কদেব, মহামন্ত্রী ও প্রধান রাজপুরুষগণ আনন্দিত হলেন।

আনন্দিত হল সারা প্রদ্যুম্নপুরবাসী।

আলোক মালায় সজ্জিত হল সারা রাজ্য।

সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদের বিশ্রামাগারে প্রসন্ন অন্তরে কিছুক্ষণ বসে রইলেন রঘুনাথ।

পিতা পঞ্চানন ঘোষাল, রাজপুরোহিত অর্কদেব, মহামন্ত্রী, প্রধান অমাত্যগণ উপস্থিত হলে রঘুনাথকে আর একটু বিলম্ব করতে হলো।

রঘুনাথের সিংহাসনে আরোহণের দিন ঘোষণা করলেন মহামন্ত্রী।

আগামী ইন্দ্রদ্বাদশী তিথিতে ইন্দ্রপুজা সমাপ্ত করে সিংহাসনে আরোহণ করবেন রঘুনাথ।

প্রস্তাব সাগ্রহে স্বীকৃত হল।

রঘুনাথ ঘোষণা করলেন। পিতা পঞ্চানন ঘোষাল প্রদ্যুম্নপুরের প্রধান পরামর্শদাতার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তাঁর উপাধি হবে মহাপাত্র।

মল্লসদৃশ শক্তির অধিকারী বলদীপ রঘুনাথের বংশ মল্ল বংশ বলে চিহ্নিত করার ও তাঁর শাসিত রাজ্য মল্লভূম নামে অভিহিত করার জন্য পঞ্চানন ঘোষালের নির্দেশও অবনত মস্তকে মেনে নিলেন রঘুনাথ।

সভা ভঙ্গ হল।

প্রাসাদ অলিন্দে মশালের আলোছায়া এক স্বপ্নালোকের রূপ নিয়ে মায়াময় হয়ে রয়েছে।

সেই স্বপ্নালোকের মধ্য দিয়ে হেঁটে গিয়ে চন্দ্রকুমারীর কক্ষের দ্বারপ্রান্তের নিকটে এসে রঘুনাথ শুনতে পেলেন কিঙ্করী পরিবৃতা হয়ে তাদের মথিত কৌতূহল নিবৃত্ত করতে অস্থির হয়ে রয়েছে বধূ চন্দ্রকুমারী।

কক্ষে প্রবেশ করেন রঘুনাথ।

অকস্মাৎ নূপুর নিক্কণের আঘাতে চমকিত হয় কক্ষতল।

কিঙ্করী ও সহচরীর দল কক্ষ ছেড়ে চলে যায়।

গন্ধ তৈলদীপ জ্বলে দীপাধারে। অগুরুবর্তিকায় সুবাসিত, পুষ্পস্তবকে সজ্জিত কক্ষ সুভীরু বাসনার শিহরের মত অবশ হয়ে রয়েছে।

মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকেন রঘুনাথ।

চন্দ্রকুমারীর কবরী-গ্রথিত-চন্দ্রোপলের রশ্মির চেয়েও সান্দ্র ও স্নিগ্ধ চক্ষুর রশ্মিধারা সর্বাঙ্গে মেখে এগিয়ে যান। দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করে নিবিড় সমাদরে চন্দ্রকুমারীর চিবুক স্পর্শ করে প্রশ্ন করেন।

—তুমি সুখী হয়েছ চন্দ্র?

যেন এক স্বপ্নের জগতে ডুবে যায় চন্দ্রকুমারী। কৌতূহলের আবেগে সব ভয় ও লজ্জা সরিয়ে জীবনের প্রথম প্রিয়দর্শনের প্রতি আহ্বান জানায়।

—এস, আমার কাছে এস।

সহসা দক্ষিণবায়ু চঞ্চল হয়, অগুরু সৌরভ ওড়ে! দীপ স্থির হয়ে যায়। রঘুনাথের আলিঙ্গণে সমর্পিত তনু চন্দ্রকুমারীর সত্তা এক পরম স্পর্শ-মহোৎসবে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

প্রদ্যুম্নপুর রাজ্যে বৎসরের পর বৎসর বর্ষা-বসন্তের খেলা শেষ হয়। রঘুনাথ মল্লের সিংহাসনে আরোহণের সময়কে চিরস্মরণীয় করবার জন্য ঘণ্টাধ্বনি করে এক নতুন বর্ষ গণনা শুরু হয়েছে।

এই নব প্রতিষ্ঠিত অব্দের নাম মল্লাব্দ।

দুর্ধর্ষ শক্তিধর মহারাজা রঘুনাথ মল্ল তাঁর সাহায্যকারী সাঁওতাল বাহিনীকে তাঁর রাজ্যে ঠাঁই দিয়ে অল্পসময়ের মধ্যেই মল্লভূমের সীমা বহু পার্শ্ববর্তী রাজাকে পরাজিত করে বর্ধিত করেছেন।

রঘুনাথ মল্ল এখন মহারাজা আদিমল্ল নামে বন্দিত।

আজ আর এক ইন্দ্রদ্বাদশী তিথি।

নবোষার আলোকে আপ্লুত প্রদ্যুম্নপুরের ঘণ্টা ফটক থেকে অব্দের ঘণ্টা বাজবে। প্রাসাদ অভ্যন্তর থেকে মহারাজা রঘুনাথ মল্ল দুর্গফটকের দিকে এগিয়ে আস-

ছিলেন। রক্ষী সম্মুখে এসে নত হয়ে অভিবাদন করে সংবাদ পরিবেশন করে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু মহারাজা রঘুনাথ নিজে প্রাসাদদুর্গ ছেড়ে ব্যস্তভাবে ছুটে গিয়ে রাজোদ্যানে প্রবেশ করলেন। তৃণাচ্ছিত পথরেখার উপর দিয়ে অগ্রসর হয়ে প্রেঙ্খাকুঞ্জ পার হয়ে লতামণ্ডিত অতিথি-বাটীকার দ্বারে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

অতিথি-বাটীকায় চয়িত পুষ্পশয্যায় ক্ষয়িত দেহ জটাজুট এক মৃতদেহের মুখের দিকে তাকালেন মহারাজ রঘুনাথ।

তাঁর হৃৎপিণ্ড চূর্ণ করে অকস্মাৎ হাহাকার ধ্বনিত হল।

—একি—ভাস্কর সিংহ। রঘুনাথ আবার উচ্চ কণ্ঠে ডাকলেন।

—ভাস্কর সিংহ।

কেউ সাড়া দিল না, কেবল রাজপ্রাসাদের ঘণ্টা ফটকে অশ্বের ঘণ্টার ধ্বনি বাজে দীর্ঘ লয়ে।

এক—দুই—তিন…।

সমাপ্ত